প্রোফেসর

ইন্দ্রাণী সান্যাল

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—
শ্রীরাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য বি. এ.
পি ১৮৭ বাঙ্গুর এভিনিউ
কলিকাতা-২৮

প্রিণ্টার—
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য
কো-অপারেটিভ প্রেস
১, ছিদামমুদি লেন,
কলিকাতা—৬

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

করকমলেষু

স্নেহধন্য লেখক

১

নৃসিংহগড়ের বাসষ্টপ।

সারাদিন কতলোক ওঠানামা করে নৃসিংহগড়ের বাসষ্টপে। শতকরা পঁচানব্বই জন অপরিচিত। কারো কথা মনে থাকে না। মনে রাখবার মত লোক না হলে মনে থাকবে কেন? মন একটুখানি জিনিস, ভাল না লাগলে তার মধ্যে কাউকে ধরে রাখবার মত জায়গা কোথায়?

একদিন একটি মেয়েকে দেখে ভাল লাগল।

শান্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন মুখ। পোশাকের পারিপাট্য নাই, যা পরেছে তাইতে মানিয়েছে। হাতে একটি ব্যাগ; এক হাতে হাত ঘড়ি, অন্য হাত নিরাভরণ।

দেখা গেল এই ষ্টপে বাসে ওঠে সে ছোট রুমাল দিয়ে মুখের, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে, বিকেলে ছ'টা, কোন কোন দিন তারও পরে নামে এই ষ্টপে।

কোন দিকে তাকায় না। হঠাৎ যদি কোন দিকে, কারো দিকে চোখ পড়ে মনে হয় চোখ দু'টো তার নাকের গোড়াতে নয়, উত্তর পোলের ভাসমান বরফের পাহাড়ের খাঁজে বসানো হয়েছে। অথবা মনে হয় চোখ দু'টো আসল নয়, নকল, কোন কিছুর ছায়া পড়ে না সে চোখে।

যখন এই ষ্টপে ওঠে নামে বোঝা গেল নৃসিংহগড়ের মেয়ে। চেষ্টা করলে খোঁজখবর কিছু পাওয়া যেতে পারে। সূত্র মিলে গেল একদিন নামবার সময়ে ব্যস্তবাগীশ এক বুড়ো যাত্রীর ধাক্কায় হাতের ব্যাগটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলে। কুড়িয়ে ব্যাগটা ফেরৎ দেবার আগে নাম পাওয়া গেল ব্যাগের গায়ে, প্রোঃ ইন্দ্রাণী সান্যাল এম. এ.,……কলেজ।

প্রোফেসর? বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ মনে হয়, তা হতে পারে। কোন্ বিষয়ের? একটা 'থ্যাঙ্ক ইউ' ছুঁড়ে দিয়ে এমন হন হন করে ছুটল যে, জিজ্ঞেস করবার অবসর পাওয়া গেল না।

আর জিজ্ঞেস করা যাবে না। রোজ কি আর ব্যাগটা হাত থেকে পড়ে যাবে? আজ যে ব্যাগ কুড়িয়ে দিল তার দিকে কাঁচের চোখ দিয়েও তাকিয়ে দেখেনি, সুতরাং পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রশ্ন করবার কোনও সুযোগ হবে না।

না হোক, নাম যখন পাওয়া গেল খবর বের করা পাঁচ-সাত-দশ দিনের ফের।

খবর কিছু পাওয়া গেল।

নৃসিংহগড়ের মেয়ে বটে। তেইশ বছর বয়সে ইতিহাসে এম. এ. পাশ করে দু'বছর হল কলকাতার এক মেয়ে কলেজে চাকুরি করছে। রোজ সাত মাইল+সাত মাইল চৌদ্দ মাইল পথ বাস ট্রামে পাড়ি দিয়ে চাকুরি চালায়। ছাত্রী আমলেও তাই চালাতে হত।

মেয়েটি মেধাবিনী। বৃত্তি পেয়ে ক'টা পরীক্ষায় পাশ করেছে। কলেজে বেতন দিতে হয়নি। টিউশানি করে কিছু কিছু রোজগার করে পড়াশোনা চালিয়েছে। এত দিনে খেয়ে পরে একটু ভদ্রভাবে চলবার অবস্থায় পৌঁছেছে।

পরিবার তেমন ছোট নয়। বৃদ্ধ পিতা রমেশ সান্যাল সরকারী কোন অফিসের কেরানী ছিলেন, কিছু পেনশন পান। বাতে পঙ্গু, চলাফেরা বড় করতে পারেন না। এক বিধবা ভগ্নীকে প্রতিপালন করতে হয়। প্রথম পক্ষের দু'টি সন্তান ছেলে। বড় হয়েছে তারা। একজনের লেদের কারখানা আছে। দ্বিতীয়টির ইলেকট্রিক জিনিসের দোকান আছে, মিস্ত্রির লাইসেন্স আছে। নিজেদের পরিবার নিয়ে তারা কলকাতায় থাকে। কাজকর্ম করে, ছবি দেখে, নেশা করে, বাপ ও বোনদের কিছু কিছু দেয়। বন্ধন আলগা হয়েছে, ছিঁড়ে যায়নি।

দ্বিতীয় পক্ষের তিনটি সন্তান মেয়ে। ইন্দ্রাণী বড়। দ্বিতীয় শিবানী বি এ ক্লাসের ছাত্রী। সকলের ছোট শর্বাণী হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। এদের খরচ সংগ্রহ করবার জন্য ইন্দ্রাণীকে টিউশানি করতে হয়, কোচিং ক্লাস নিতে হয়।

ইন্দ্রাণী দেখতে ভালই। বিয়ে করে এসব ঝামেলা এড়াতে পারত। বোনরা ভেসে যাবে ভেবে বোধহয় বিয়ে করেনি। বোন দু'টি অত কিছু ভাবে না। হাবে ভাবে তারা দিদিকে বোঝাতে চায় ভাসলেই বা কি হয়েছে, সাঁতরে ডাঙ্গায় উঠে পড়বে এক সময়ে। তাদের ওপর চোখ রাখতে হয় ইন্দ্রাণীকে, কিছু বাড়তি ঝামেলা পোয়াতে হয়।

বিধবা পিসীকে নিয়েও কিছু ঝামেলা পোয়াতে হয়। জীবনে কত কি লোকসান গিয়েছে তাঁর, ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলতে ভাল-বাসেন তিনি। সর্বদা অসন্তোষের ফল্গুধারা বইছে মনে। ছোট দু'টি ভাইঝি মুখফোড়, বিশেষ কিছু বলতে ভরসা পান না তাদের, নির্ভয়ে জমানো দুর্বাক্যের জঞ্জাল ইন্দ্রাণীর কান লক্ষ্য করে ছুঁড়তে থাকেন। ইন্দ্রাণীর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে চুপ করে সব শুনে যাওয়া।

আরও কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে ইন্দ্রাণী সান্যালের সম্বন্ধে। নৃসিংহগড় ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় ডাঃ এন. পি. চ্যাটার্জির বাড়ীতে হানা দিতে হয়েছিল এজন্য। বিখ্যাত হিস্টোরিয়ান ডাঃ নিরঞ্জনপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আগে সরকারী শিক্ষাবিভাগে ছিলেন, বছর পাঁচ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। নিউ স্কুল অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। কয়েকখানা নামকরা গ্রন্থের লেখক।

ইন্দ্রাণী এঁর একজন প্রিয় ছাত্রী। সুশোভন, সুবিমল, অনিমেষ, দীপঙ্কর প্রভৃতি নাম করা প্রাক্তন ছাত্র যারা তাঁর নূতন আইডিয়া প্রচার করছে, যাদের নিয়ে নিউ স্কুল অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের চাইতে প্রাক্তন ছাত্রী ইন্দ্রাণীর প্রতিপত্তি বেশী তাঁর কাছে এবং তাঁর বাড়ীতে। তাঁকে স্যর বলা অনেক

দিন ছেড়ে দিয়েছে সে, ডাকে মেসোমশাই বলে এবং তাঁর গৃহিণীকে ডাকে মাসীমা বলে।

বি. এ. পড়বার সময় তাঁর ছাত্রী হবার সৌভাগ্য হয় ইন্দ্রাণীর, ক্রমে তাঁর স্নেহ লাভ করবার সৌভাগ্যও হয়। সেই থেকে তিনি নানাভাবে ছাত্রীকে সাহায্য করে এসেছেন। এম. এ. পাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার চাকুরি পেয়ে যাবার মধ্যেও তাঁর হাত ছিল।

তাঁরই উৎসাহে ডক্টরেট নেবার জন্য ইন্দ্রাণী পড়াশুনা করছে এখন।

ডাঃ চ্যাটার্জি বলেন নানা অসুবিধা, বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ইন্দ্রাণী যে এতখানি উঠতে পেরেছে তাতে করে তার চরিত্রের দৃঢ়তা, কর্তব্য-নিষ্ঠা এবং উচ্চ আশার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সব চেয়ে বড় জিনিস তার বুদ্ধির প্রখরতা, জানবার কৌতূহল এবং তথ্য থেকে তত্ত্বে পৌঁছবার ক্ষমতা। কিছু সাহায্য, কিছুটা অনুকূল অবস্থা পেলে সে সত্যিকাব বড় স্কলার হতে পারবে তার বিষয়ে এতে কোন সন্দেহ নাই। গোড়া থেকে বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় নিয়ে পড়বার সুযোগ পেলে হয়ত সে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হতে পারত। তিনি আশা করছেন নিউ স্কুল অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি গ্রুপের মধ্যে সে একজন নামকরা ঐতিহাসিক হবে।

প্রোফেসর ইন্দ্রাণী সান্যালের সম্বন্ধে এই সব খবর পাবার পরে মনে হল নৃসিংহগড়ের অবস্থা এবং আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করলে সে পরিবেশ থেকে এই রকম জোরালো চরিত্রের একটি মেয়ের বেরিয়ে আসা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এরপর তার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। কি সে ভাবে, কি সে করতে চায় জীবনে তার মুখ থেকে শোনবার কৌতূহল চেপে রাখা গেল না।

কিন্তু কৌতূহল তৃপ্ত করা সব সময়ে সহজ নয়। মোটেই আমল দিল না ইন্দ্রাণী, বলল গল্প করবার মত অবসর নাই তার। ডাঃ নিরঞ্জনপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের শরণ নিতে হল আবার। তাঁর

হস্তক্ষেপের ফলে একটু নরম হল মেয়েটি। ফেরবার সময় বাস থেকে নেমে খানিকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে দু'চারটে কথা বলত, বাড়ী চোখে পড়লে জানিয়ে দিত এবার আপনি কেটে পড়ুন মশাই। মানে ভদ্রভাবে বলত, আচ্ছা নমস্কার।

এইভাবে তার কথাগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে থলিতে ভরবার পরে থলি খুলে নাড়াচাড়া করে মনে হল একটুখানি যেন জানা গেল কোন পথ ধরে স্কলার ইন্দ্রাণী সান্যালের ভাবনাগুলো চলাফেরা করে।

এই বয়সে সত্যি সে বেশ পড়াশোনা করেছে! এম এ. পাশ করেছে মডার্ণ হিষ্ট্রিতে। থিসিসের বিষয় নির্বাচন করেছে মধ্য যুগের ভারতীয় ইতিহাস থেকে। প্রবন্ধ লেখে এনসেন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রির বিষয় নিয়ে।

সত্যি সে চিন্তা করে, চিন্তার ওরিজিনালিটি আছে।

সে বলে ইতিহাস কি এক রকমের? একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে কি সব রকম ইতিহাসের আলোচনা করা সম্ভবপর? সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস আছে, সমাজ বিকাশের, মানুষের ভাবনা, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তির ইতিহাস, প্রতিপত্তি লাভের, অপরের অর্জিত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বড় হবার চেষ্টার ইতিহাস, গড়ে ওঠবার, ভেঙ্গে পড়বার ইতিহাস, কত রকমের ইতিহাস রয়েছে; জ্ঞানে গুণে উচ্চ আসনের অধিকারী হয়েও একটা জাত কেন যে বর্বরদের হাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী মার খেয়েছে তারও একটা ইতিহাস আছে। জাতিতে জাতিতে, রাজায় রাজায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বড় স্থান দিয়ে শুধু সেই কাহিনীর বর্ণনাকে ইতিহাস বলবার মানে কি হয়? পোলিটিকেল হিষ্ট্রি ইতিহাসের একটা দিকের বর্ণনা মাত্র।

সে বলে ইতিহাস রচনায় যাঁরা হাত দিয়েছেন সত্য কথা বলবার আগ্রহ তাঁদের মনে কতটা প্রবল ছিল? নিজের জাতিকে বড় করে দেখাবার, অন্য জাতিদের ছোট করে দেখাবার ইচ্ছা কি অনেক সময়ে তাঁদের মন অধিকার করেনি? ইতিহাসের সত্য

মিলবে কোথায়? অতিভাষণ ও নীরবতার মধ্যে থেকে সত্য উদ্ধার করবার আশা কতটা সফল হতে পারে?

আরও অনেক কথা ভাবত ইন্দ্রাণী, হাতড়ে বেড়াতো বলা যায়। পরিচ্ছন্ন করে, বিশ্লেষণ করে সব জিনিস ভাববার বয়স ও বিদ্যা তখনও তার হয়নি, তবু ভাবত অনেক কথা, অনেক গভীর তত্ত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

যে সব ছেলেমেয়ের এ রকম করে ভাববার অভ্যাস হয়ে যায়, ইন্দ্রাণী সান্যালের যেমন হয়েছিল, হট করে কিছু করতে পারে না তারা। নূতন জিনিস মাথায় বা মনে এলে তখনই ধরে ফেলে তাকে। উল্টেপাল্টে দেখে, টিপে দেখে। মানে অযথা ঝাঁকি খেতে, ঝক্কি পোয়াতে চায় না তারা অপরিচিত নূতনকে মনের মধ্যে গতিবিধির অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে।

বোঝা গেল শুধু পণ্ডিত নয়, অনেকটা সতর্ক, সাবধানী মেয়ে প্রোফেসর ইন্দ্রাণী সান্যাল।

ইন্দ্রাণী সান্যালের সম্বন্ধে খবর নেবার, তার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টার ফলে নৃসিংহগড়ের কথাও কিছু জানা গেল। সামান্য দু'চারটে কথা বলা হচ্ছে।

বেশীর ভাগ কচুরিপানায় ঢাকা খাল ডোবা, নীচু জায়গা, সাপ, ব্যাং, শেয়ালের সঙ্গে দু'চার ঘর একচালা খড়ো ঘরের অধিবাসী মানুষ বাস করত আগে, এখন যে জায়গাটার নাম হয়েছে নৃসিংহগড়। তারপর এক সময়ে দুড়দাড় করে নানা জায়গা থেকে মানুষ এসে বসে যেতে লাগল খড়ের, টিনের, খাপরার, টালির, এসবেসটসের ঘর বানিয়ে। জমির মালিক কলকাতার কোন গলির মধ্যে বড় বড় থামওয়ালা পুরনো বাড়ীতে পুরনো ভারি খাটে শুয়ে গড় গড়া টেনে, তাস পাশা খেলে, গঙ্গাস্নান করে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি দশ পাঁচটি হিন্দী-ভাষী লাঠিধারী লোক জোগাড় করে পাঠিয়ে দিলেন জবর দখলিকারদের ভাগিয়ে দিতে। সুবিধে হল না। মামলা মোকদ্দমা

চলল কিছুকাল, তাতেও কোন সুবিধে হবার আশা দেখা গেল না।

এর মধ্যে বাড়ী ঘরের সংখ্যা, লোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল মাসের পর মাস। দু একটা করে একতলা, দো'তলা পাকাবাড়ী উঠতে লাগল, দোকানপাট দেখা দিল, চায়ের দোকান, দর্জির দোকান, হেয়ার কাটিং সেলুন বসল। ছেলেদের ড্রামাটিক ক্লাব, পল্লী উন্নয়ন সমিতির অফিস হল, মেয়েদের স্কুল হল।

কচুরিপানা, ডোবা, খাল এখনও আছে, তবু জায়গাটার চেহারা একেবারে পাল্টে গিয়েছে তারপরের কয়েক বছরের মধ্যে।

এইটুকু জায়গা কেন, মানুষের হাতে পৃথিবীর চেহারা পাল্টাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে না কেবল মানুষের স্বভাব।

দু'জন লোক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন এই পল্লীতে।

একজনের নাম শ্রীনৃসিংহদেবদাস ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। নাম থেকে বোঝা যায় ইনি শ্রীনৃসিংহদেব, যাঁর নাম থেকে পল্লীর নাম হয়েছে নৃসিংহগড়, তাঁর সেবাইত।

শ্রীনৃসিংহদেবের কালো পাথরের বিগ্রহটি ইনি এখানে আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসে খড়ের চালা ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। লোকজন তখন কম ছিল, বিঘা পঁচিশেক জমি নিজেই দেবোত্তর লিখে নিয়েছিলেন শ্রীনৃসিংহদেবের নামে। পল্লীতে বসতির উপযুক্ত ভাল জমি। দেবতার নামে উপযুক্ত প্রণামী নিয়ে কাঠা হিসাবে এই জমিতে ধীরে ধীরে লোক বসিয়েছেন। পাঁচ বিঘে এখনও হাতে আছে। দেবতার পাকা মন্দির হয়েছে, নিজের পাকা এক-তলা বাড়ী দো'তলা হয়েছে। লোকবলে, অর্থবলে, প্রতিপত্তিতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পল্লীর একজন প্রধান ব্যক্তি; তাঁকে ছেড়ে পল্লীর কোন কাজ হয় না, হতে পারে না। হতে দেবেনই বা কেন?

পল্লীর আরেকজন মাতব্বর ব্যক্তি সুকোমল ভৌমিক। বিচক্ষণ কারবারী মানুষ। অনেক রকমের কারবার চালিয়ে অনেক পয়সা করেছেন এবং করছেন। কেউ কেউ বলে ব্ল্যাক মার্কেটিং করেন।

কি হয়েছে তাতে ? ব্ল্যাক মার্কেটিং তো লোকসম্মত উপায়ে পয়সা রোজগারের ব্যাপার। যে উপায় লোকসম্মত, সকল স্তরে চালু হয়েছে, তাকে ব্ল্যাক বলা হয় গায়ের জোরে, দুধে-আলতা রংয়ের বললে কি দোষ হয় ?

সুকোমল ভৌমিক যত টাকা রোজগার করেন সবটাই ব্যাঙ্কে পাঠান না, বা ব্যবসায়ে খাটান না, পল্লী উন্নয়নের কাজে, জনহিতকর কাজে কিছু ব্যয় করেন। উচ্চমহলে খাতির আছে বলে সরকারী তহবিল থেকেও টাকা খসিয়ে আনেন। পল্লীতে যে এতগুলো টিউবওয়েল বসেছে, রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে, স্কুল চলছে, এর পিছনে তাঁর অর্থ আছে, হাতও আছে। নূতন একটা আইডিয়া সম্প্রতি তাঁর মাথায় এসেছে, নৃসিংহগড়ে মেয়েদের জন্য একটা কলেজ খোলা যায় কিনা। আইডিয়া এখনও বীজের অবস্থায় আছে, অঙ্কুর বেরোয়নি। মানে তাঁর বন্ধু মহলে কথাটা দু' একবার বলেছেন মাত্র। কলেজ খোলা বড় ব্যাপার, প্রচুর খরচের ব্যাপার গোড়াতে, সব দিক ধীরভাবে চিন্তা করে দেখছেন।

নৃসিংহগড়ের দুই মাতব্বর ব্যক্তির মধ্যে চরিত্রে ও কর্মে পার্থক্য আছে সহজে বোঝা যায়। তাহলেও তাঁরা মিলে মিশে কাজ করেন।

২

নৃসিংহগড়ের অধিকাংশ সমর্থ বয়সের পুরুষদের সকাল থেকে ছড়িয়ে পড়তে হয় নানা দিকে জীবিকা অর্জনের চেষ্টায়। অনেকের কর্মস্থান কলকাতা এবং কলকাতার আশে পাশে। কলেজের ছেলে-মেয়েদের কলকাতায় ছুটতে হয়।

প্রোফেসর ইন্দ্রাণী সান্যালকেও রবিবার ও ছুটির দিন বাদে অন্যদিন সকাল এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে বাড়ী থেকে দশবারো মিনিট পা চালিয়ে হেঁটে বাসষ্টপে এসে বাস ধরতে হয়। পা চালিয়ে হাঁটা তার অভ্যাস। নৃসিংহগড় রোডের দু'পাশের নীচু জমি কচুরিপানায় ঢাকা। শত শত কচুরিপানার বেগুনি রংয়ের ফুল ফুটে যখন দৃশ্য পাল্টে দেয় সে তাকিয়ে দেখে না। কোলা ব্যাং লাফিয়ে পায়ের কাছে এসে পড়লে, ডোবা থেকে উঠে এসে সাপ রাস্তা পার হচ্ছে দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, থামে না, ভয়ও পায় না। এ সবে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

বাসষ্টপ আর মিনিট তিনের পথ, একদিন দেখল বাঁদিকের ডাঙ্গা জমিটাতে মাটি কাটা হচ্ছে, লরী বোঝাই বাড়ী তৈরীর মাল মশলা ফেলা হচ্ছে। বুঝল কোন পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ী হচ্ছে। কিন্তু এখানে, এই খাল, ডোবা, কচুরি পানা, সাপ, ব্যাংয়ের মুলুকে কেন? কি আকর্ষণ আছে এখানে? জমির দাম কম এটা ঠিক, কিন্তু অসুবিধাও তো অনেক আছে।

যায় আসে, চোখে পড়ে বাড়ী তৈরীর কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। কারা বাড়ী করছে সে গুজবও কানে এল। কলকাতায় বাড়ী একজন পয়সাওয়ালা শৌখিন ব্যক্তি বাগান বাড়ী তৈরী করছেন। ভাবল বাগান বাড়ী আজ কাল বড়লোকেরা তৈরী করে নাকি?

দুই তিন যুগ আগে করত। এ যুগে পয়সাওয়ালা লোকদের ফুর্তি করবার ব্যবস্থা অন্য রকমের হয়েছে।

তারপরে শোনা গেল শৌখিন বড়লোক নয়, একজন নামকরা সায়ান্টিষ্ট নিরিবিলিতে কাজ করবার জন্য কলকাতার হট্টগোল ছেড়ে এখানে বাড়ী করছেন। আরও কিছুদিন পরে সায়ান্টিষ্টের নাম শোনা গেল, ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী। কোন্ বিজ্ঞানের লোক? এ খবর কেউ দিতে পারল না। শুধু শোনা গেল সায়ান্স কলেজে, সায়ান্স এসোসিয়েশনে কাজ করেন।

এক বছরের মধ্যে বাড়ী হয়ে গেল। কমপাউণ্ড ওয়ালের ওপরে লোহার এঙ্গেল লাগিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হল। দেখতে দেখতে কাঁটাতারের বেড়া জড়িয়ে লতা উঠে সব ঢেকে দিল।

হঠাৎ দু' একদিন চোখে পড়ত নিজে গাড়ী চালিয়ে একজন ফর্সা, রোগা মত ভদ্রলোক বাড়ীতে ঢুকছেন, ফটকের নেপালী দারোয়ান তাড়াতাড়ি বড় লোহার গেট খুলে দিচ্ছে। ইনিই কি বাড়ীর মালিক নামকরা বিজ্ঞানী ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী, ভাবত ইন্দ্রাণী।

দু'একদিন লতাবেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ত ভদ্রলোকটি হাতে সিগারেট নিয়ে খোলা বারান্দায় পায়চারি করছেন, একটা শাদা মোটা কুকুর তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরছে। একটি বর্ষীয়সী শাদা কাপড় পরা মহিলাকেও মাঝে মাঝে দেখতে পেত বারান্দায়।

একজন নামকরা বিজ্ঞানী নৃসিংহগড় রোডে বাড়ী করলেন নিরিবিলিতে গবেষণা করবেন বলে। কি নিয়ে তিনি গবেষণা করেন জানবার একটু কৌতূহল হয় ইন্দ্রাণীর। মনের কৌতূহল মনে চেপে রাখে। আলাপ-হবার কোন সম্ভাবনা নাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে নৃসিংহগড়ের অধিবাসীদের কারো আলাপ হয়েছে বলে জানা যায় না। তাঁর বাড়ীতে কাউকে যেতে দেখেনি কখনও, তিনিও

বাড়ীর সীমানা পেরিয়ে পল্লীর পথে দশ গজ রাস্তা গিয়েছেন বলে জানা যায় না।

চার পাঁচ মাস কেটে গেল।

ইন্দ্রাণীর কৌতূহল কমে গিয়েছে। তার নিজের কাজের চাপ এত বেশী যে, বাড়তি কৌতূহল মনে পুষে রাখবার আগ্রহ বোধ করে না, সময়ও নাই। একটা কথা কিন্তু তার মনে ঘোরাফেরা করে, কৌতূহল নয়, একটু কৌতুক বোধ করে।

কলেজ যাবার পথে মাঝে মাঝে নূতন বাড়ীতে যাঁকে দেখা যায় সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হয় মানে সে হেঁটে যায়, তিনি গাড়ীতে যান। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে তাকান একটু। হয়ত গাড়ীর গতি এক সময়ের জন্য কমে যায়, তারপর গাড়ী চলে যায়। বাসষ্টপে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভদ্রলোকটির গাড়ী একটু পরে পৌছল, মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখলেন, বোধহয় কিছু ভাবলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর চলে গেলেন। এই ভদ্রলোকটিই নামকরা বিজ্ঞানী ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী কিনা সে জানে না, হতেও পারেন, কিন্তু মনে হয়েছে ইচ্ছা করলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়, একটি নমস্কারে অপরিচয়ের ব্যবধান দূর করা সম্ভব।

নমস্কার। আপনি কি বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী? আমি একটি মেয়ে কলেজে ইতিহাস পড়াই, নৃসিংহগড়ে আমার বাড়ী, আপনার প্রতিবেশিনী বলা যায়। আপনার সাবজেক্ট কি? অরগ্যানিক কেমিষ্ট্রি না এপ্লায়েড কেমিষ্ট্রি? বায়োকেমিষ্ট্রি, সয়েল কেমিষ্ট্রি না ইলেকট্রো কেমিষ্ট্রি? ফিজিক্স, ম্যাথেমেটিক্স, বায়োলজি, 'নিউক্লিয়ার ফিজিক্স না ইলেকট্রনিক্স? আপনার বাড়ীতে অনেক ফুলের গাছ চোখে পড়ে, গার্ডেনিং বোধ হয় আপনার হবি? কখন আপনি ফ্রি থাকেন? একদিন যাওয়া যাবে আপনার বাড়ী আপনার রিসার্চের কথা শুনতে, যদি আপত্তি না থাকে।

এই তো আলাপ হয়ে গেল, নিজের মনে হেসে নিজের মনকে বলে ইন্দ্রাণী।

আরও কিছুদিন কেটে গেল।

কলেজে কাজের পরে একটা ফাংশন ছিল, তাড়াতাড়ি করলেও ফিরতে দেরি হল।

সারাটা পথ দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছে, ক্লান্ত মনে হচ্ছিল শরীর, দশবারো মিনিট পা চালিয়ে হাঁটতে হবে বাড়ী পৌঁছতে।

আগে জোর বৃষ্টি হলে জলে ডুবে যেত পথ, এখন মাটি, খোয়া ফেলে কিছু উঁচু করা হয়েছে। কেরোসিনের আলো দেবার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু কেরোসিনের অভাবে আলো জ্বলছে না আজকাল। যারা সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফেরে তাদের অনেকের টর্চ আছে। যাদের পকেটে বাড়তি পয়সা আছে সাইকেল রিক্সা চাপে তাদের কেউ কেউ।

অন্ধকার হয়ে এসেছে যখন ইন্দ্রাণী বাস থেকে নামল। তাড়াতাড়িতে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাতে ভুলে গিয়ে, যে ধরণের হাওয়া দিচ্ছিল তার কথা ভুলে গিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

কয়েক পা গিয়েছে কালবৈশাখীর ঝড় ভেঙ্গে পড়ল।

ঝড়ের তীব্র বেগে পড়ে যাবে সে মনে হল। রাস্তার পাশের খাল ডোবার কচুরিপানা ঝড়ে ছিঁড়ে এসে তার গায়ে পড়তে লাগল। এত অন্ধকার যে, কিছু আর চোখে পড়ছে না। তারপর ঝড়ের সঙ্গে আরম্ভ হল প্রবল বৃষ্টি।

খানিকটা দূরে চায়ের দোকানে হ্যাজাক—জ্বলছিল। আশ্রয় নেবে বলে সেই আলো লক্ষ্য করে চলবার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সে আলো নিভে গেল, একটা প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। বোধহয় দোকানের টিনের চালা উড়ে গেল।

যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। মনে ভয় ছিল অন্ধকারে চলতে গিয়ে পাশের খালের মধ্যে পড়ে

যাবে, তলিয়ে যাবে কচুরিপানার নীচে। হু'চারটে গাছ ভেঙ্গে পড়বার শব্দ কানে এল।

ক্রমে ঝড়ের বেগ কমে এল, বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দে কানে তালা লাগছিল। রাস্তা জলে ডুবে যাচ্ছে মনে হল।

এমন বিপদে এর আগে পড়েনি ইন্দ্রাণী।

মনে হল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে সে, মরে যাবে হয়ত এবার। রাস্তার উপরেই পড়ে থাকবে তার মৃতদেহ, না হয় ভেসে কচুরিপানার নীচে চলে যাবে। সাপ, ব্যাং, ছোট ছোট মাছ, পোকামাকড় কিলবিল করছে পানার নীচের হুর্গন্ধ জলে, ছেয়ে ফেলবে তার দেহ।

সত্যি সত্যি পড়ে যাবে জলে-ডোবা, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপরে মনে হচ্ছিল, তীব্র আলোর ফলক এসে গেঁথে ফেলল তাকে, তারপরেই শব্দ করে একখানা গাড়ী থেমে গেল তার মনে হল।

বাহুতে একটা আকর্ষণ অনুভব করে চেঁচিয়ে উঠল, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, বাড়ী যাবো আমি।

কে মিষ্টি গলায় বলল, বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি আসুন, ভয় নেই।

তারপর কি হল স্মরণ নাই ইন্দ্রাণীর।

জ্ঞান হল ঘণ্টা হুই পরে।

দেখল একখানা খাটে শুয়ে রয়েছে সে বড় একটা ঘরে। এক কোণে চেয়ারে বসে একজন বর্ষীয়সী মহিলা টেবিল ল্যাম্পের আলোতে বই পড়ছেন।

উঠে বসল ইন্দ্রাণী।

ভদ্রমহিলাটি উঠে কাছে এসে বললেন, এখন কেমন বোধ করছ মা? এমন হুর্যোগে কি মানুষ পথে বেরয়? সুপ্রসন্ন যখন নিয়ে এল ধূলো কাদায়, কচুরিপানায় মানুষ বলে চেনা যায় না।

তারপর গরম হুধ খেতে দিলেন, চা খাবার আনলেন। বললেন, তুমি খেয়ে নাও, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব আমি।

হেসে বললেন, দেখছ কি, কাপড় ? ওটা সুপ্রসন্নর ধুতি, সেমিজটা আমার, তোমার কাপড় জামা ছাড়িয়ে কেচে রেখেছি।

আমার ব্যাগটা কি হারিয়েছে ? এতক্ষণ পরে ইন্দ্রাণী বলল।

না হারায়নি, আছে।

সেই লম্বা, রোগা, ফর্সা ভদ্রলোকটি ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, উনি কেমন আছেন দিদি ?

আয় ঘরে। সেরে উঠেছে, কিছু খেতে দিয়েছি।

ঘরে এলেন। বললেন, আপনি খেয়ে নিন। যদি যেতে পারবেন মনে করেন পৌঁছে দিয়ে আসব। না পারলে আপনার বাড়ীর লোক কাউকে আনতে হবে, কাল সকালে যাবেন।

যেতে পারব আমি।

বেশ, খেয়ে নিন। ওঁর খাওয়া হয়ে গেলে আমাকে ডেকো দিদি।

বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আধ ঘণ্টা পরে ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তীর দিদি নেপালী ড্রাইভারকে নিয়ে ইন্দ্রাণীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলেন।

পরের দিন ইন্দ্রাণী নিজে এসে কাপড় সেমিজ ফেরৎ দিল ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তীর দিদির হাতে। কৃতজ্ঞতা জানাল তাঁকে, নিজের কিছু পরিচয় দিল। ডাঃ চক্রবর্তী বাড়ী ছিলেন না, তাঁকে ধন্যবাদ দেয়া হল না !

দশ মিনিট বসে ওঠবার সময়ে বলল, ডাঃ চক্রবর্তীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারলাম না, তাঁকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

আচ্ছা, বলব।

এরপর মাস খানেকের ওপরে বাসষ্টপে যাবার বা সেখান থেকে ফেরবার পথে ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময়েও লতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাঁর চেহারা চোখে পড়েনি। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা বা আলাপ না হলেও তাঁর সম্বন্ধে খানিকটা কৌতূহল ইন্দ্রাণীর মনে রয়ে গিয়েছিল।

আরও কয়েকদিন পরে ডাঃ চ্যাটার্জির চিঠি পেয়ে ইন্দ্রাণী এক রবিবারে সকাল সকাল তাঁর বাড়ীতে গেল। সে সারাদিন থাকবে ডাঃ চ্যাটার্জি লিখেছিলেন।

ডাঃ চ্যাটার্জির ঘরে যাবার আগে তাঁর স্ত্রীর, মানে ইন্দ্রাণীর মাসীমার সঙ্গে দেখা হল। অনেক দিন সে আসে না অভিযোগ করে খানিকটা বকাঝকা করলেন তিনি, তারপর খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দিলেন। বললেন, ওঁর কাছে গিয়ে বসলে উঠতে পারবি না চট করে, খেয়ে নে।

ইন্দ্রাণীর এই মাসীমার একটু ইতিহাস আছে। ইতিহাস মানে ছাত্রী থেকে গৃহিণীর পদে ওঠবার ইতিহাস। ডাঃ চ্যাটার্জির অধ্যাপক-জীবনের প্রথম দিকের ছাত্রী ছিলেন তিনি।

বড়লোকের মেয়ে, পড়াশোনায় ভাল, দেখতেও ভাল।

ভাল ছাত্রী, ইনটেলিজেণ্ট, পড়াশোনা করে, প্রশ্ন করলে ভাল উত্তর দেয়, আলাপ হয়েছিল খানিকটা এইভাবে। পড়া বুঝতে অধ্যাপকের বাড়ীতে আসত মাঝে মাঝে, অধ্যাপকের অনুমতি নিয়ে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে। বিনীত, মিষ্ট ব্যবহারে অধ্যাপকের বৃদ্ধা, সৌম্যমূর্তি মাতাকে হাত করে ফেলল মাত্র দু'তিন বার যাতায়াত করে। পুত্রের ছাত্রীকে ক্রমে ভালবেসে ফেললেন তিনি, ছেলের কাছে তার ছাত্রীর গুণের কথা বলতেন মাঝে মাঝে।

পরীক্ষার দু'মাস আগে অনেক অনুরোধ আবেদন করে অধ্যাপককে গৃহশিক্ষকের কাজ নিতে রাজি করাল। তার কথা, আমি ভাল করে পাশ করতে পারলে আপনার খ্যাতি বাড়বে স্যর। অধ্যাপকের বাড়ীতে এসে পড়তে হত দু'দিন, দু'দিন তিনি ছাত্রীর বাড়ীতে যেতেন পড়াতে।

পরীক্ষা হয়ে গেল, গৃহশিক্ষকের চাকুরিও শেষ হল।

ছাত্রী অধ্যাপকের মাতার কাছে বসে একদিন বলল, মাসীমা, আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে, আর আসতে হবে না।

মাসীমা বললেন, পরীক্ষা শেষ হল তো কি হয়েছে ? আমাকে দেখতে এসো যেদিন ইচ্ছে হয়। কেমন ?

খুশী মুখে ছাত্রী বলল, আচ্ছা। স্যর কিছু মনে করবেন না তো মাসীমা ?

তার সঙ্গে না দেখা করলে ? তাহলে তাকেও একটু দেখে যেয়ো।

ছাত্রী মুখ লাল করে মাথা হেঁট করে বসে রইল। অনেক বয়স হলেও মাসীমার চোখ খুব ভাল রয়েছে বুঝতে পারল। একটু পরে বলল, ছু' একটা রান্না শিখে নিতে চাই আপনার কাছে, তাই—

পুত্রের ছাত্রীর জন্য খাবার আনতে দিয়েছিলেন। তার কাছে খাবারের ডিস এগিয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা। রান্না শিখে পরীক্ষা দেবে নাকি স্যরের কাছে ?

তারপর বললেন, দেখো মা, তুমি বড় লোকের মেয়ে, আমাদের গরীবের ঘর। সব দিক ভেবে চিন্তে দেখো, নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রো। বাপ মায়ের অবাধ্য হওয়া ভাল নয়। ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে যেয়ো না।

বড় লোকের মেয়ে, বাপ মার আছুরে মেয়ে হলেও ঝোঁকের মাথায় কিছু করবার মেয়ে নয়। ঝোঁককে সামলে রাখতে জানত। স্যরের সঙ্গে দেখা হলে মাথা নামিয়ে আঁচল খুঁটত না, হাসিমুখে নমস্কার করে বলত, আজ মাছটা আমি রাঁধব স্যর, দয়া করে ভাল নম্বর দেবেন। স্যর বলতেন, ভাল নম্বরের যোগ্য হলে দেব, পার্শিয়ালিটি করতে পারব না।

ছু'মাস পরে পরীক্ষার ফল শুনে বাপ মা যখন আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, গৃহশিক্ষকের প্রশংসা করলেন, সেই সাইকোলজিকেল মুহূর্তে মায়ের কানে কানে মনের কথা জানাল মেয়ে।

আর ঠিক সেই সময়ে ছাত্রীর সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে অধ্যাপক দেখা করতে এসেছেন খবর পাওয়া গেল। ছাত্রী এসে

প্রণাম করে তাঁকে ওপরে মায়ের কাছে নিয়ে গেল, মৃদুকণ্ঠে বলল, মাকে একটা প্রণাম করবেন স্যর, বাবাকেও করবেন।

এক মাস পরে জাঁকজমকের সঙ্গে ছাত্রী কায়েমীভাবে অধ্যাপকের গৃহে প্রবেশ করল মাথায় সিঁদুর, কাপড় দিয়ে।

পনের বছর কেটে গিয়েছে তারপর। স্যরকে একটি কন্যা, দু'টি পুত্র উপহার দিয়েছেন এর মধ্যে। শাশুড়ী মারা গিয়েছেন, বাড়ীর কর্ত্রী তিনি।

খেতে খেতে ইন্দ্রাণী বলল, মেসোমশাই কেন ডেকেছেন জানেন মাসীমা?

বোধহয় অনেক দিন তোকে দেখেন না তাই আসতে লিখেছেন। দিন চার আগে অনিমেষের চিঠি এসেছে শুনেছি, হয়ত চিঠিখানা দেখাতে চান তোকে।

খাওয়া সেরে ডাঃ চ্যাটার্জির ঘরে গেল ইন্দ্রাণী।

টেবিলে চার পাঁচ খানা বই খোলা, মোটা এটলাসের বই খোলা, এক হাতে লালনীল পেন্সিল, অন্য হাতে অর্দ্ধদগ্ধ সিগার, গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন তিনি।

মিনিট দুই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রাণী।

হাতের সিগারের ধোঁয়া বেরোচ্ছেনা দেখে ম্যাচেস খুঁজতে গিয়ে ছাত্রীর ওপরে দৃষ্টি পড়ল। ও, তুমি। বসো বসো। খুঁজছিলাম তোমাকে সপ্তাহ দুই আসছ না দেখে। খবর সব ভালো তো?

খবর বিশেষ ভাল না হলেও ইন্দ্রাণী বলল, হ্যাঁ, ভালো।

থিসিস লিখতে আরম্ভ করেছে কিনা ইন্দ্রাণী জানতে চাইলেন।

ইন্দ্রাণী জানাল মাল মশলা গুছিয়ে নিচ্ছে, এখনও লিখতে আরম্ভ করেনি।

তাগিদ দিলেন। তারপর টেবিলের ওপর থেকে ক'খানা টাইপ করা কাগজ হাতে নিয়ে বললেন, অনিমেষের একটা চিঠি পেলাম। জার্মান কাগজে প্রকাশিত একটা লেখার কপি পাঠিয়েছে। লিখেছে,

এ দেশের কোন কাগজে ছাপত না এ লেখা, তাই জার্মান কাগজে পাঠিয়েছিল।

বললেন, অনিমেষের একটা দোষ নরম করে সমালোচনা করতে পারে না।

প্রবন্ধটির কপি হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখল ইন্দ্রাণী, যেটুকু জার্মান সে জানে তাতে করে এ লেখা বোঝা অসম্ভব। জিজ্ঞেস করল, কি লিখেছে অনিমেষ?

ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, বিষয় ইণ্ডিয়ান লীডরশিপ। নূতন কিছু বলেনি। কিন্তু এত স্পষ্ট করে, তীক্ষ্ণ ভাষায় বলবার সাহস কারো হয়নি আগে। বলেছে, দলের মধ্যে খাঁটি, শক্ত রিভোল্যুশনারী কেউ ছিল না, সবাই ছিল নরম মেন অব কমপ্রোমাইজ। প্রত্যেকটি ক্রাইসিজের মুখে দাঁড়িয়ে কমপ্রোমাইজ করেছে তারা। দেশের ইণ্টারেষ্টের কথা ভেবে নয়, দলের হাতে ক্ষমতা রাখবার কথা ভেবে। সুপারষ্টিশাস ও ক্রেডুলাস মাসকে মিরাকেলের স্তোক দিয়ে প্যারা-লাইজ করে রাখা হয়েছে। দলের সবগুলোর প্রাণ যেতে পারত, গেল শুধু একজনের,—এই ধরণের কথা সব।

তারপর বললেন, অনিমেষ ইজ এংগ্রি। মন থেকে রাগ ও বিরক্তি দূর করে সংযত ভাষায় এনালিটিকেল ষ্টাইলে বক্তব্য প্রকাশ করতে না পারলে লোকে তার কথায় কান দেবে না যত সত্যি হোক তার বক্তব্য। এ হিষ্টোরিয়ান মাষ্ট হেভ এ ডিট্যাচড্ আউট-লুক। পার্সোনালিটি নয়, ফ্যাক্টস ও প্রব্লেমস নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তাকে কাজ করতে হবে। হিষ্টোরিয়ান পার্টিজেন নয়, কোল্ড-ব্লাডেড, কুল-হেডেড রেকর্ডার।

ইন্দ্রাণী বলল, কিন্তু দেশের সত্যিকার ইণ্টারেষ্টে আঘাত লাগছে দেখেও—

প্রতিকার যদি চাও, হিষ্ট্রি লেখবার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ করো, পার্টি গড়ো, বক্তৃতা দাও, প্রোপাগাণ্ডা চালাও, মানে পলিটিকস করো।

ইন্দ্রাণী বলল, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার মুখ বন্ধ করা—

ডাঃ চ্যাটার্জি—কোথায় সেটা নাই? দলীয় গভর্ণমেণ্ট যেখানে আছে সেখানে এই ব্যাপার। ডিক্টেটরশিপের মনোপলি নয় সমালোচকের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করা।

তারপর হেসে বললেন, সুশোভনকে দেশ ছেড়ে পোলাণ্ডে গিয়ে চাকুরি নিতে হয়েছে। সুবিমল জাপানে চলে গিয়েছে, অনিমেষকে বাইরে যেতে হবে হয়ত। মনে হচ্ছে নিউ স্কুল অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি উইল বি এ স্কুল ইন একজাইল, যেমন গভর্ণমেণ্ট ইন একজাইল গঠন করা হয়।

দেশের মধ্যে থাকছে দীপঙ্কর, আর্লি ও মেডাইভেল হিষ্ট্রির ব্যাফলওয়ালের আড়ালে থেকে কাজ করছে। আর থাকছ তুমি। তোমার ভবিষ্যৎ কোন উপায়ে ইনসিওর এগেনষ্ট রিস্‌ক করা যায় কিনা ভাবছি।

মুখ তুলে তাকাল ইন্দ্রাণী, বুঝলাম না আপনার কথা মেসো-মশাই।

দরকার নাই বোঝবার। মেডাইভেল হিষ্ট্রি নিয়ে কাজ করছ, করে যাও।

তারপর বললেন, এ সব কথা থাক, তোমার কথা কিছু শুনি।

আমার আর কি কথা আছে, ইন্দ্রাণী বলছিল, তার পরেই বলল, আচ্ছা মেসোমশাই, ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী নামের কে একজন বিজ্ঞানী আছেন, আপনি চেনেন?

চিনি। কেন বলো তো?

আমাদের পল্লীতে নূতন বাড়ী করেছেন ভদ্রলোক। শুনেছি নাম করা বিজ্ঞানী। নূতন বাড়ী করেছেন সেখানে বসে রিসার্চ করবেন বলে। তাঁর সাবজেক্ট কি?

আলাপ হয়েছে?

সামান্য একটু মুখচেনা হয়েছে, আলাপ হয়নি।

ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী নাম করা বায়োকেমিষ্ট।

আমাদের দেশে বায়োকেমিষ্ট্রিতে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত আর কেউ নাই শোনা যায়। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম কলকাতার কাছে কোথায় বাড়ী করেছেন লেবরেটরী গড়বেন বলে ; বাড়ীটা তোমাদের পাড়ায় জানতাম না। কিছু বয়েস হয়েছে ভদ্রলোকের, তবে বেশী নয়। এ হ্যানসম, ডিসেণ্ট ম্যান। এণ্ড হি হ্যাজ এন ইণ্টারেষ্টিং হিষ্ট্রি। শুনতে চাও না কি ?

বলুন না।

একটি রোমাণ্টিক, করুণ গল্প বললেন ডাঃ চ্যাটার্জি।

ছাত্র হিসাবে প্যারিসের পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে কাজ করতেন সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী। ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র, বাইরে যাবার আগেই নাম হয়েছিল। ভদ্র চেহারা, অমায়িক ব্যবহার। পাণ্ডিত্যে খাঁটি, মানুষ হিসাবে খাঁটি। আরও কিছু গুণ ছিল। যন্ত্র সঙ্গীতে, বিশেষ করে এসরাজে ভাল হাত ছিল। অপূর্ব এসরাজ বাজাতেন। ছবি, বিশেষ করে পোট্রেট, আঁকতেন ভাল। এতগুলো গুণ ছিল একটি অল্প বয়সের যুবকের।

প্রাক্তন ছাত্রীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, এরপর কি হল বলতে পারো ?

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, প্যারিসের সব মাদামোয়াজেল তাঁর ভালবাসায় পড়লেন ?

প্যারিসিয়ান মাদামোয়াজেলদের খবর জানি না, ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, একটি বাঙালী মেয়ের খবর শুনেছি। কলকাতার এক বড়লোকের মেয়ে, একমপ্লিশ্‌ড, প্যারিসে গিয়েছিল মিউজিক সম্বন্ধে রিসার্চ করতে। মাধবী তার নাম। ভাল মেয়ে।

দু'জনের আলাপ পরিচয় হল, বন্ধুত্ব হল। বন্ধুত্ব থেকে প্রণয়. বিয়ের কথাবার্তাও হল। দেশে ফিরলে বিয়ে হবে।

সুপ্রসন্ন চক্রবর্তীর কাজ শেষ হতে তখনও ছ'সাত মাস দেরি। মাধবীর ইচ্ছা এই সময়টা সে প্যারিসে কাটাবে, তারপর দু'জন একসঙ্গে ফিরবে।

কিন্তু তা হল না, মাধবীর ঠাকুরদার গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে মাধবীকে ফিরতে হল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ঠাকুরদা তাকে খুব ভালবাসতেন।

মাধবী ঠাকুরদাকে সুপ্রসন্নর কথা লিখেছিল, তার ছবি পাঠিয়েছিল, তার রিসার্চের কথা লিখেছিল, অধ্যাপকদের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিল। সুপ্রসন্নকে বিয়ে করতে চায়, পাশে থেকে তার কাজে সাহায্য করতে চায় এ সব কথাও লিখেছিল। ঠাকুরদা লিখেছিলেন, তোমরা দেশে ফিরে এসো, বাবাজীকে দেখি আমি, তারপর বলব আমার কথা।

মাধবীর মনে একটুকুও সন্দেহ ছিল না দাতুকে রাজি করাতে পারবে।

তারপর এল দাতুর অসুখের খবর।

ফিরে এসে দেখল দাতু সত্যিই মৃত্যু শয্যায়।

দাতু বললেন, তুই একা এলি দিদি, ছেলেটিকে নিয়ে এলি না কেন ?

আরও চার পাঁচ মাস লাগবে ওর কাজ শেষ হতে, কাজ শেষ হলেই চলে আসবে স্থির হয়েছে।

অতদিন আমি তো টিঁকব না দিদি। যা হোক, মন ঠিক করেছিস কি সত্যি করে ? ছেলেটি ভালো, আমি ওর বাড়ীতে, আরও অনেক জায়গায় খবর নিয়েছি।

মাধবী অনেক কথা বলল দাতুকে।

একমাসের ক'দিন আগে মাধবীর দাতু মারা গেলেন। বাড়ীতে দাতু ছিলেন তার একমাত্র বন্ধু।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে দাতুর এটর্নীর কাছে মাধবী খবর পেল দাতু তাকে তু'লাখ টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

চার মাস পরে প্যারিসের ঠিকানায় এই এটর্নীর লেখা চিঠি পৌঁছল সুপ্রসন্নের হাতে। সে তখন দেশে ফেরবার ব্যবস্থা করছে জানিয়ে মাধবীকে চিঠি দিয়েছে। এটর্নী জানিয়েছেন মোটর

দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মাধবী মারা গিয়েছেন সাতদিন আগে। মৃত্যুর আগে উইল করে আপনাকে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে গিয়েছেন আপনার কাজের জন্য। তাঁর কিছু কাগজপত্র গচ্ছিত রেখেছেন আমাদের কাছে আপনাকে দেবার জন্য। আপনি দেশে ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করলে বাধিত হব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, এরপর দশ বছর কেটে গিয়েছে। সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী বিয়ে করেননি। নিজের রিসার্চ, কলেজের কাজ, সায়েন্স এসোসিয়েশনের কাজ নিয়ে থাকেন, বিশেষ মেশেন না কারো সঙ্গে। কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়।

ইন্দ্রাণী চুপ করে গল্প শুনছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল।

ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, আলাপ করতে চাও বিখ্যাত প্রতিবেশীর সঙ্গে ?

একটু হেসে ইন্দ্রাণী বলল, বড়লোক, বিখ্যাত লোক, আমার মত চুনোপুঁটির সঙ্গে আলাপ করে সময় নষ্ট করবেন কেন তিনি ?

তা করতে পারেন, কোন কমপ্লেকস নাই, অতি ভদ্র। আচ্ছা, কাল আমি ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলব ফোনে, তারপরে যেদিন ইচ্ছে যেয়ো।

ইন্দ্রাণী কোন উত্তর দিল না।

৩

ডাঃ চ্যাটার্জির মুখে ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তীর জীবন কাহিনী শোনবার পরে যাতায়াতের পথে বা বারান্দায় পায়জামা পরা, লম্বা, ফর্সা ভদ্রলোকটিকে লতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়াত ইন্দ্রাণী নিজের অজ্ঞাতসারে।

তাঁকে দেখলেই মাধবীর কথা মনে পড়ত ইন্দ্রাণীর। ভাবত কেমন দেখতে ছিল মাধবী? নিশ্চয় খুব সুন্দরী। বড়লোকের মেয়ে তো। দুর্ঘটনায় মারা যাবার আগে তাঁকে দু'লাখ টাকা দিয়ে গেল। ভাবল না আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে তাকে ভুলে যেতে ক'দিন লাগবে ছেলেটির? দেখা যাচ্ছে ভোলেননি, দশটি বছর কেটে গিয়েছে, বিয়ে করেননি, বিজ্ঞানের রিসার্চ নিয়ে থাকেন।

ইন্দ্রাণীর মুখের দু'চারটি কথা শুনে অনেকে অনেক কথা রটিয়েছে ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে। টাকাওয়ালা মানুষ, দাম্ভিক, কাউকে বাড়ীতে ডাকেন না, আলাপ করেন না কারো সাথে। তাঁর বিজ্ঞানে খ্যাতির কথা আমলে আনে না লোকে। বয়ো-কেমিষ্ট্রি আবার কি বিজ্ঞান? ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করে। ইন্দ্রাণী বলে জৈব বিজ্ঞান, কেমিষ্ট্রি অব লাইফ। তাঁর মানে কি? মানে ইতিহাসের লেকচারার ইন্দ্রাণীও বিশেষ জানে না, বলে বায়োলজির একটা বিভাগ।

ইন্দ্রাণীর ভাল লাগে ভদ্রলোকের জীবনকাহিনী. মাধবীর প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমের কথা। ভাবত বিজ্ঞানী হিসাবে বিখ্যাত উনি, মানুষ হিসাবে অনেক উঁচুদরের মানুষ। ভাবত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে যেতে সাহস হচ্ছে না তার, গেলে তাঁর কথা শুনত বসে বসে, দু'একটা অকিঞ্চিৎকর কথা নিজেও বলত হয়ত।

এর মধ্যে একখানা চিঠি এসে পৌঁছল ইন্দ্রাণীর হাতে।

হাতের লেখা দেখে বুঝল অনিমেষের চিঠি।

অনিমেষ ডাঃ চ্যাট্যার্জির অন্যতম প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র, নিউ স্কুলের একজন সভ্য। ডাঃ চ্যাটার্জির মতে ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, একটু খেয়ালী। তার একখানা বুলেটিনের কথা আগে বলা হয়েছে।

ইন্দ্রাণী জানত নিউ স্কুল দলের কয়েকজনের মধ্যে অনিমেষ একটু দুর্বলতা পোষণ করে তার সম্বন্ধে। ব্রিলিয়ান্ট, রূপবান ছেলে, উদার মনের ছেলে। তাকে ভাল লাগত ইন্দ্রাণীর। তাই বলে তাকে ভালবাসবার কথা, ভালবাসবার তাগিদ মনে আসেনি। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, শুধু এক পোঁচ রং বেশী।

দিল্লীতে এক কলেজে চাকুরি করছিল। লিখেছে এ চাকুরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করছে সে, দিল্লীর আবহাওয়া অসহ্য ঠেকছে। সব শ্রেণীর কর্তৃপক্ষদলের সব জায়গাতে সব কিছুর মধ্যে লেফটিজমের গন্ধ শোঁকবার চেষ্টা করবার ফলে নাসিকার গঠন দ্রুত বদলে গিয়ে এক শ্রেণীর রোডেণ্টের নাসিকার আকার নিচ্ছে। সাধু ভাষায় এই শ্রেণীর নাম যেন কি মনে পড়ছে না। নিজের আর্যজাতিসম্মত সরল, উচ্চ নাসিকার গঠন নিয়ে বেশ একটু বিপদেই পড়া গিয়েছে।

শেষের দিকে নিজের মনের কথা একটু বলবার চেষ্টা করেছে। লিখেছে, কতবার মনে করি কলকাতা পালিয়ে যাই, তোমার শান্ত মুখ, সুন্দর হাসি চোখে দেখি, তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ, মিষ্ট ব্যবহারের আস্বাদ গ্রহণ করি। ওর মধ্যে আমার মন ভাল করবার, এই নোংরা পৃথিবীকে ভালবাসার অনেক কিছু রয়ে গিয়েছে।

রাত জেগে চিঠির উত্তর লিখল ইন্দ্রাণী। লিখল, তোমার চিঠি পড়ে ভাল লাগল অনিমেষ। আমার জীবন বড় স্ট্রাগলের জীবন। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে চাই আমি। এইটুকু করবার জন্য দিনরাত খাটতে হচ্ছে, অনুভব করছি ধীরে ধীরে আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। কিছু সুবিধা হতে পারে এই আশায় থিসিস লেখবার

কথা মাথায় ঢুকেছে, কাজের বাইরে যা এমন কোন কথা ভাববার সময় পাই না। তোমার সুযোগ সুবিধা অনেক, কেন যে যে-কাজ আরম্ভ করেছিলে তা তাড়াতাড়ি শেষ করছ না, জানি না, ইত্যাদি।

ডাঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা হবার পরে একমাসের ওপরে কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে একটু ইচ্ছা থাকলেও ইন্দ্রাণী ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ করতে যেতে পারেনি। যেতে পারেনি মানে তেমন ইচ্ছা হয়নি।

একদিন কাজ থেকে ফিরছে। বাস ষ্টপে নেমে খানিকটা গিয়েছে ডাঃ চক্রবর্তীর গাড়ী পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল। গাড়ী থেকে নেমে এসে নমস্কার করলেন তিনি।

বললেন, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন ফোনে জানিয়ে ছিলেন ডাঃ চ্যাটার্জি। সময় করে উঠতে পারেননি বোধ হয়?

সাহস করে উঠতে পারিনি।

কেন, ডাঃ চ্যাটার্জি কি তেমন ভীতিজনক কিছু বলেছেন আমার সম্পর্কে?

হেসে বললেন, সেই ঝড়ের রাতে আপনার হাত ধরাতে ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু না ধরে উপায় ছিল না। আপনাকে তুলে নিয়ে গাড়ীতে ওঠাতে, নামাতে হয়েছিল, জানতে পারেননি। আর দু'চার মিনিট দেরি হলে অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে যেতেন। ভয়ানক ঝড়ের ধাক্কা খেতে হয়েছিল, তারপর দারুণ বৃষ্টি।

তারপর বললেন, যদি বিশেষ কাজ না থাকে আসুন না এখন, কিছুক্ষণ বসে যাবেন।

গাড়ীতে উঠে বসল ইন্দ্রাণী।

সেদিনকার সেই বর্ষীয়সী মহিলা, ডাঃ চক্রবর্তীর দিদি, অভ্যর্থনা করলেন।

চা খাবার পরে ডাঃ চক্রবর্তী বলছিলেন ডাঃ চ্যাটার্জির প্রিয় ছাত্রী আপনি, তাঁর কথায় বুঝলাম আপনার সম্বন্ধে উঁচু ধারণা—

একটু হেসে ইন্দ্রাণী বলল, আমাকে স্নেহ করেন তিনি, এইটুকু হল নির্ভরযোগ্য তথ্য।

বেশ। এবার বলুন আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা মনে হল কেন? দেখা মানে আলাপ করবার কথা।

ইন্দ্রাণী বলল, তেমন করে যে মনে হয়েছিল তা নয়। আপনার সহৃদয়তার কথা বলছিলাম ডাঃ চ্যাটার্জিকে। তিনি যা বললেন আপনার বিষয়ে—থাক সে কথা। মেসোমশাই, ডাঃ চ্যাটার্জিকে মেসোমশাই বলি আমি, ধরে নিয়েছিলেন আমি আলাপ করতে চাই। তাই ফোন করেছিলেন আপনাকে। সত্যি যে এর কিছু দরকার ছিল তা নয়। হয়ত মনে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে হলেই সব কিছু করা যায় না। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আলাপ করব কি নিয়ে? আপনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী, আমি আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রীদের ইতিহাস পড়াই পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য। তাই ভরসা করে আসতে পারিনি।

আপনার বিষয়ে আপনি পণ্ডিত, ডাঃ চ্যাটার্জি বলেছেন। তাঁর কথার দাম আছে আমার কাছে।

তারপর উঠে দাঁড়ালেন, আচ্ছা আসুন। আমার লেবরেটরী দেখবেন।

লেবরেটরীতে নিয়ে গেলেন।

চার দেয়ালে চারটা আলো জ্বলে উঠল। দিনের মত সব কিছু চোখে পড়ে।

প্রথমে চোখ পড়ল দোরের বিপরীত দিকের দেয়ালে টাঙানো একটা বড় অয়েল পেন্টিংয়ের ওপরে। মিনিট খানেক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছবিখানার দিকে। না বলে দিলেও তার বুঝতে আটকাল না মাধবীর ছবি এটা। অজ্ঞাতসারে দৃষ্টি ঘুরে গেল ডাঃ চক্রবর্তীর মুখের ওপর দিয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, ইন্দ্রাণীর তাঁর মনে হল।

তারপর মাইক্রোসকোপটার দিকে এগিয়ে গেল।

যন্ত্রটার ওপরে হাত বুলিয়ে বলল, এই যন্ত্রটার মধ্যে দিয়ে আপনি জীব-সৃষ্টির রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন ?

হাসলেন ডাঃ চক্রবর্তী, কি সন্ধান পেয়েছি শোনবার আগ্রহ আছে নাকি ?

খুব। তাই বলে আপনার হাতে কাজ থাকলে সময় নষ্ট করতে চাইনে।

কাজ থেকে ফিরছেন। ক্লান্ত আপনি, আজ থাক ; আরেক দিন হবে যদি অনুমতি দেন।

লেবরেটরী থেকে বেরিয়ে এল ইন্দ্রাণী, বলল, আপনার কাজের যন্ত্রপাতি দেখলাম, আপনার বাজনার যন্ত্রগুলো কোন্ ঘরে থাকে ?

ডাঃ চ্যাটার্জি খবর দিতে কৃপণতা করেননি বুঝতে পারছি। সব কিছু এক দিনে দেখে কৌতূহল মিটিয়ে নিতে চান ?

কৌতূহল অত সহজে মেটে না। আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে আবার আসবার নিমন্ত্রণ করছেন ?

হ্যাঁ। শনিবার, রবিবার বিকেলে ঘণ্টা দু'তিন ফ্রি থাকি, সময় হলে, ইচ্ছে হলে আসবেন। চা খাবেন, কথাও হবে।

আচ্ছা, দেখা যাক্। সাহস বজায় থাকলে আসতে পারি, আজ আপনি ধরে এনেছেন।

শুনুন মিস সান্যাল, আমি একেবারে হার্মলেস এনিম্যাল, আপনার সাহসের অভাব হবার কোন হেতু নাই। আসবেন অনুগ্রহ করে।

হেসে ইন্দ্রাণী বলল, আচ্ছা।

ফটক পর্য্যন্ত সঙ্গে এলেন ডাঃ চক্রবর্তী, বললেন, অন্ধকার হয়ে আসছে, আলো নিয়ে একজন লোক সঙ্গে দিই ?

না, তার দরকার হবে না। নমস্কার।

ডাঃ চক্রবর্তীর নিমন্ত্রণ থাকলেও শনিবার কি রবিবার বিকেলে তাঁর বাড়ীতে গেল না ইন্দ্রাণী।

রবিবারে ছোট বোনকে নিয়ে ছবি দেখতে গেল।

ছোট বোন শর্বাণী ছবি দেখছিল, সে চোখ বুঁজে ভাবছিল। বাড়ীতে সংসারের কাজকর্ম করতে হয়, পড়াশোনা করতে হয়, এলোমেলো ভাববার সময় নাই। পথ চলতে চলতে আর ছবি দেখতে বসে সে এলোমেলো ভাবনা'ভাববার বিলাসিতা উপভোগ করে।

দু'একটা চুল পেকেছে ডাঃ চক্রবর্তীর। কত বয়স হল? পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হতে পারে। যৌবনের লালিত্য রয়েছে চেহারায়, ঝড় ঝাপ্টার চিহ্ন নাই কোথাও, শান্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন। সমুদ্র মন্থন করে অমৃত আনতে হয়নি তাঁকে, অমৃত উঠে এসেছিল মুখের কাছে। একটি মেয়ের ভালবাসা পাবার, তাকে ভালবাসবার অমৃত আকণ্ঠ পান করে অমর হয়েছেন তিনি। মেয়েটি তাঁকে ভালবেসেছিল যত তাঁর কাজকে ভালবেসেছিল তত। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে তার সব সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছিল প্রিয়তমকে, কাজের সফলতার মধ্যে ভালবাসার সফলতা প্রমাণ করতে পারেন যেন তিনি এই আশায়, আর যা দেবার ইচ্ছে ছিল তা তো দিতে পারল না মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতের ফলে। দেশবিদেশের পণ্ডিত সমাজে ডাঃ চক্রবর্তীর গবেষণার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, সার্থক হয়েছে মাধবীর স্বপ্ন।

ইন্দ্রাণী ভাবে নিজের কাজে সফলতা লাভ করে, যশের উঁচু সিঁড়িতে পৌঁছে সুখী হয়েছেন কি ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী?

বাইরে থেকে দেখে লোকে বলবে তাঁর ঘর অন্ধকার, স্ত্রী নাই, ছেলে মেয়ে নাই. হাসি কান্না, ছুটোছুটি নাই, সুখী হবেন কি করে? তারা বলবে সুখের স্বর্ণরেণু মেশানো রয়েছে সংসারের ধূলো কাদার মধ্যে, ধূলো কাদা খানিকটা না ঘাঁটলে সুখের স্বর্ণরেণু হাতে পৌঁছয় না।

একেবারে বাজে কথা। মানুষের সাধনা সুখের সাধনা নয়, দেবত্বের সাধনা।

দেবত্ব কাকে বলে? সুখ দুঃখের পরপারে চলে গিয়েছে যে, কাম্য বলে যার কাছে কিছু নাই, তপস্যার আনন্দে যে কায়-মন-বুদ্ধি তপস্যার মধ্যে লয় করে দিয়েছে, সেই তো দেবতা।

ডাঃ চক্রবর্তী কি দেবত্বে পৌঁছে গিয়েছেন? মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা কি তাঁকে স্পর্শ করে না আর?

কে বলবে?

আর এ কৌতূহল তার মনে আসছেই বা কেন? চোখ খুলে পরদার দিকে চাইল একবার, আবার চোখ বুঁজল।

কি দোষ কৌতূহল আসলে? জিজ্ঞাসা যদি মানুষের জীবন থেকে গেল থাকল কি জীবনে?

মানুষের রক্তে কৌতূহল, মনে কৌতূহল, বুদ্ধিতে কৌতূহল। কৌতূহল আছে বলে সত্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে বুদ্ধিতে, এই ইচ্ছা থেকে আসে গবেষণার কথা, সাধনার কথা। এ ইচ্ছাকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করে কি সুবিধে হবে? কিচ্ছু না। এই ইচ্ছা অমর।

একটা জায়গায় যেন একটু মিলের মত দেখা যাচ্ছে। ডাঃ চক্রবর্তী জীবনের সত্য উদঘাটন করতে চাইছেন, সে চায় ইতিহাসের সত্যের সাক্ষাৎ পেতে। ক্লান্ত চোখে কেরোসিনের আলোতে মোটা মোটা বইয়ের পাতা ওল্টায় সে এই আকাঙ্ক্ষায়। মাইক্রোসকোপ টেষ্ট-টিউব দরকার হয় না তার, মাইক্রোসকোপে চোখ না লাগিয়ে বুদ্ধিতে লেন্স লাগাতে হয় তাকে।

কি কথা মনে হতে হাসল নিজের মনে। আদার ব্যাপারী সে, খবর নেবার ইচ্ছা জাহাজের। ওগো জাহাজী, দূরে থেকে নমস্কার জানাচ্ছে আদার ব্যাপারী, কাছে যাবে না সে, নাকানি চুবোনি খেতে হবে ঢেউয়ের ধাক্কায়।

চোখ বুঁজে ভাবতে ভাবতে মন কোন সময়ে অচেনা অরণ্যে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলল খেয়াল নাই, চমকে উঠল ইণ্টারভ্যালের সময় আলোগুলো জ্বলে উঠতে। ছোট বোন তার হাতে দু'টো টফি গুঁজে দিল।

ক'টা শনিবার কেটে গেল তারপর, ডাঃ চক্রবর্তীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার সময় হল না। ইন্দ্রাণী খবর পেয়েছিল তিনি একমাসের জন্য বাইরে গিয়েছেন।

মাস দুই পরে কলেজে যাবার পথে তাঁকে দেখতে পেল বাড়ীর বারান্দায় লতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে। সেদিন শনিবার।

পরদিন রবিবার বিকেলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ী গিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসবে বলে। রাস্তা থেকে লতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ডাঃ চক্রবর্তীকে বারান্দায় পায়চারি করতে দেখে ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নেপালী দারোয়ান বাগানে কাজ করছিল, তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে ফটক খুলে দিল।

ডাঃ চক্রবর্তী বারান্দা থেকে নেমে এসে নমস্কার করে বললেন, আসুন মিস সান্যাল। তিন দিন হল ফিরেছি, ভাবছিলাম আপনি ভাল আছেন কি না।

হেসে ইন্দ্রাণী বলল, কি জানা গেল ভেবে?

জানা গেল আপনি ভাল আছেন এবং নিজের ইচ্ছায় আজ এলেন। আসুন বসবেন।

ইন্দ্রাণী বলল, আপনার লেবরেটরীতে বসব, আপনার বিজ্ঞানের কথা একটু শুনব।

সাধু সঙ্কল্প. তার আগে একটু চা খেয়ে নিন।

চা খাওয়া হলে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে ডাঃ চক্রবর্তী লেবরেটরী ঘরে ঢুকলেন। দুটো আলো জ্বালিয়ে দিলেন। ইন্দ্রাণী স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মাধবীর ছবির দিকে।

তারপর ডাঃ চক্রবর্তীর দিকে ফিরে বলল, এবার বলুন জীব-সৃষ্টি রহস্যের কি সন্ধান পেলেন এই যন্ত্রগুলোর সাহায্যে?

জীব-সৃষ্টির রহস্য কি যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়? মাইক্রোস-কোপের কাজ শাদা চোখে যা দেখা যায় না তা দেখানো।

মানে ছোট জিনিসকে বাড়িয়ে দেখায়? এ কাজ তো লোকে দিন রাত করছে, মাইক্রোসকোপ চোখে না লাগিয়েও। ছোট জিনিসকে বড়, আরও বড়, অতি বড় করে দেখবার চোখ রয়েছে বলে এ দুঃখের সংসারে মানুষ কায়ক্লেশে চালিয়ে যায়। মাইক্রোসকোপ

বাজে জিনিস। টেলিসকোপের, যা দূরের জিনিস কাছে দেখায়, তার বরং একটা মূল্য আছে।

কি মূল্য আছে?

কেন? ধরুন আমার পার্সে দশটা নয়া পয়সা মাত্র আছে। টেলিসকোপের লেন্স ঘোরালাম বিড়লার পকেটের দিকে, নাকের ডগায় দেখা যাবে কারেন্সী নোটের পাহাড়, হাত বাড়ালেই যেন পাওয়া যাবে। কত বড় আশ্বাস পাওয়া গেল।

একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে হেসে ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, বস্থন, আপনার কথা শুনতে ভাল লাগছে।

প্রশংসা করে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন। বেশ। মাইক্রোস-কোপ দিয়ে জীবনের রহস্য কতখানি বোঝা গেল অনুগ্রহ করে যদি শোনান একটু—

আচ্ছা, শুমুন।

চেয়ার টেনে নিয়ে ইন্দ্রাণীর সামনে বসলেন ডাঃ চক্রবর্তী।

বললেন, জীবনের রহস্য বলতে যদি প্রাণের উৎপত্তির কথা বলেন সেটা কি করে হল এখনও অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। আমার সায়েন্স এই মাইক্রোসকোপ যন্ত্রের সাহায্যে খুঁজে বের করেছে জীবনের উপাদান কি, কেমন করে জীবনের কাজ চলছে।

অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হয়েছে সেল বা জীবকোষ নিয়ে।

যে জীবকোষ থেকে প্রাণী জগতের উদ্ভব, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ফেলে তার কাছ থেকে সব খবর আদায় করে নেয়া হচ্ছে। এ যন্ত্র না থাকলে সেল চোখে দেখা যায় না।

আপনার আঙ্গুলের কোন জায়গায় কেটে গিয়ে এক ফোঁটা রক্ত বেরল। ঐটুকু রক্তের মধ্যে রয়েছে ৩০০,০০০,০০০ লাল সেল।

প্রত্যেকটি লাল সেলের মধ্যে রয়েছে ২০০,০০০,০০০ হিমো গ্লোবিন মোলিকিউল।

সেলুলার বায়োলজি, মোলিকিউলার বায়োলজি নিয়ে কাজ করছেন যে বিজ্ঞানীরা মাইক্রোসকোপ আবিষ্কার না হলে তাঁরা

কিছু করতে পারতেন না, যেমন টেলিসকোপ স্পেক্ট্রোস্কোপ আবিষ্কার না হলে মহাশূন্যের রহস্য আবিষ্কার করা অসম্ভব হত। খনিজ লোহা, তামার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর বেঁচে রয়েছে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে জানা গিয়েছে।

ইন্দ্রাণী বলল, সেলের কাছে থেকে কি খবর আদায় হল এ পর্যন্ত ?

অনেক খবর পাওয়া গিয়েছে, সব শোনবার ধৈর্য থাকবে না।

ইন্দ্রাণী বলল, ধৈর্য যখন থাকবে না জানিয়ে দেব।

বেশ। জীবকোষ প্রাণীদেহের প্রাথমিক ইউনিট। এর কাজ জটিল, এর স্বভাব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করা। জীবকোষ বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে, একটা ভেঙ্গে গিয়ে দু'টো, দুই থেকে চার, চার থেকে আট, এই ভাবে চলে। অনেক জিনিস রয়েছে প্রতিটি জীবকোষের মধ্যে।

জীবকোষ পূর্ণ করে রয়েছে জেলীর মত সাইটোপ্লাজমের (cytoplasm) প্রাকার। এইখানে চলছে এনজিমির (enzyme) কাজ, অর্থাৎ প্রোটিন তৈরীর কাজ। এনজিমি হচ্ছে জারক। এর সাহায্যে খাদ্যরসকে রূপান্তরিত করে জীবকোষ পুষ্ট হয়। কয়েকটি প্রধান এমিনো এসিড থেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী প্রোটিন সৃষ্টি করা জীবকোষের প্রধান কাজ।

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে ক্ষুদ্রকায় নিউক্লিয়াস (nucleus)। সাইটোপ্লাজম থেকে এদের গঠন ও কাজ ভিন্ন।

নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম সূতোর মত জিনিস, এর নাম ক্রোমোজোম (chromosome)। ক্রোমোজোমের সূতোর মধ্যে সার সার নানা জিনের (gene) সমাবেশ। এই জিন হচ্ছে মোলিকিউল।

প্রত্যেকটি জিন জীবকোষের বিশিষ্ট জাতিধর্মের কারণ।

জীব কোষ বিভক্ত হবার সময়ে এগুলিও বিভক্ত হয়।

এর অর্থ এই যে জীবের বংশগত বৃত্তি ও ধর্ম এই ক্রোমোজোম-স্থিত জিনগুলিতে নিবদ্ধ। তাই এগুলিকে ব্লু-প্রিন্ট অব হেরেডিটি বলা হয়। জেনেটিক কোড নামও দেয়া হয়েছে। জীবের বিশেষ চরিত্র ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তারা জড়িত রয়েছে।

যদি কোন উপায়ে জিনকে প্রভাবিত করে তাদের উপাদান বা গঠনবৈচিত্র্যে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয় তার ফল প্রকাশ পাবে জীব-বংশের বাহ্যিক আকৃতি ভেদে।

এই দু'জন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী উত্তরাধিকারক্রমে সঞ্চারিত বৈশিষ্ট্যের হেতু জেনেটিক কোডের প্রকৃতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

যে জেনেটিক মেটিরিয়াল পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া যায় তার নাম ডি. এন. এ. (Deoxyribonucleic acid). ডি. এন. এ. জিনের মধ্যস্থিত মোলিকিউল।

জিনগুলি সাইটোপ্লাজমের মধ্যের প্রোটিন তৈরীর কারখানার কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। কি রকমের প্রোটিন তৈরী করতে হবে তার খবর জিনগুলি সাইটোপ্লাজমে পাঠায় দূতের সাহায্যে। এই দূতের নাম আর. এন. এ. (Ribonucleic acid). বিশেষ বিশেষ জিন বিশেষ বিশেষ রকমের জারক (enzyme) সৃষ্টির মূলে রয়েছে। সব জীবদেহের বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনের উপাদান বিশটি এমিনো এসিড। এই বিশটি এমিনো এসিড হচ্ছে জীবনের কেমিকেল ভিত্তি।

দেখা যাচ্ছে জীবকোষের প্রাণবৃত্তিকে এক স্বয়ংক্রিয় কারখানার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

জীবন সম্বন্ধে এই সত্য পাওয়া গিয়াছে যে সকল অরগ্যানিজমে জীবনের প্রকৃতি এক, গাছ, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ, ব্যাকটেরিয়া, ভিরাস, মানুষ, এদের সকলের লাইফ প্রোসেস এক, সকলের জীবনের রাসায়নিক ভিত্তি এক। There is fundamental unity of life.

ডাঃ চক্রবর্তী থামবার পরে কিছুক্ষণ ইন্দ্রাণী কোন কথা বলল না, তারপর আবিষ্ট ভাব ঝেড়ে ফেলে বলল, জীবদেহের মৌলিক উপাদানের সন্ধান যখন মিলেছে এগুলি টেষ্ট-টিউবে ফেলে নেড়েচেড়ে নূতন একটা জীব তৈরী করুন না।

হেসে ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, সে চেষ্টা যে করা হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে কোন সময়ে পাওয়া যেতে পারে হয়ত।

দু'চারটে প্রশ্ন জমা হয়েছে মনে, আর বিরক্ত করব না। যা শুনলাম এতক্ষণ তাই ভুলে যাচ্ছি। যদি বিরক্ত না হন আর এক দিন প্রশ্ন করব।

না, বিরক্ত হব না। কিন্তু এর পর আমি জানতে চাইব আপনি কি কাজ করছেন। ডাঃ চ্যাটার্জি বলেছিলেন একটা থিসিস তৈরী করবার জন্য পড়াশোনা করছেন।

মুখ তুলে একটু হাসল ইন্দ্রাণী, বলল, একটা থিসিস তৈরী করা কি বিশেষ বড় কাজ ? যে অবজারভেশন পোষ্টে উঠতে পারলে নানা দেশের, নানা জাতির ইতিহাসের নদীর আঁকা-বাঁকা গতি দেখে, জোয়ার ভাটার সময় তালিকা বিশ্লেষণ করে বড় কোন তত্ত্বে পৌঁছানো সম্ভব হয় সেখানে ওঠবার সামর্থ্য কোথায় পাব ? অথচ ওঠবার আকাঙ্ক্ষা দিয়েছেন ভগবান কোন সম্বল না দিয়ে। এ যে কি বিশ্রী ব্যাপার—

হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, বড় বিজ্ঞানীর লেবরেটরীতে বসে বড় বড় কথা বলবার ভূত চেপেছে মাথায়, দেখছেন তো ?

ডাঃ চক্রবর্তী হাসলেন না ইন্দ্রাণীর কথা শুনে, মুখ তুলে তাকালেন তার দিকে। চিন্তাজড়িত. নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি।

এ দৃষ্টির অর্থ করতে পারল না ইন্দ্রাণী, বলল, আপনি কিছু ভাবছেন, আমার বিদায় নেবার সময় পার হয়েছে খেয়াল করিনি।

না, পার হয়নি। আচ্ছা মিস সান্যাল, ডাঃ চ্যাটার্জি আপনাকে স্নেহ করেন বলেছিলেন, তিনি তো সাহায্য করতে পারেন—

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী, বলল, মেসোমশাই বরাবর সাহায্য করছেন।

তারপর হেসে বলল, আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম তাঁর বাড়ীতে যাব বলে। পথে আটকে গেলাম।

যদি যেতে চান আমি পৌঁছে দিচ্ছি, ডাঃ চক্রবর্তী বললেন।

আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আরও ছ'চারটে কথার পরে ইন্দ্রাণী নমস্কার করে বিদায় নিল।

ডাঃ চক্রবর্তী ফটক পর্যন্ত সঙ্গে এলেন, বললেন, খানিকটা পথ এগিয়ে দিতে পারতাম আপনি অনুমতি দিলে।

আমি একাই যাতায়াত করে থাকি, কোন অসুবিধা হবে না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল ইন্দ্রাণী।

৪

ইন্দ্রাণীর বাড়ীতে বাতে পঙ্গু, আফিংখোর পিতাকে নিয়ে, মুখরা, স্বার্থপর পিসীকে নিয়ে দুই উঠতি বয়সের বোনকে নিয়ে কমবেশী অশান্তি বারোমাস লেগে থাকত।

দুই বোনের কলেজের খরচ অনেক লাগত। তাদের সাজ পোশাকের খরচও বেড়ে চলছিল। এ সব খানিকটা গা সহা হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রাণীর। ইদানীং নূতন অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল মেজ-বোন শিবানীর প্রেমে পড়বার রোগ নিয়ে।

বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী সে, উনিশ কুড়ি বছর বয়স, প্রেমে পড়বার ইচ্ছা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পনের বছর বয়েস থেকে সে পাড়ার কোন না কোন ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে ইন্দ্রাণী শুনে আসছে। হালের ব্যাপার একটু নূতন রকমের। তিন চারটে ছোকরার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়েছে শিবানীর অনুগ্রহ-দৃষ্টি লাভ করবার দাবি নিয়ে। এই প্রতিন্দ্বন্দ্বিতা কথার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, মাঝে মাঝে মারামারি, মাথা ফাটাফাটি হয়ে যায়। পাড়ায় ঘোঁট আরম্ভ হয়েছে এই নিয়ে।

শিবানীকে ধমকালে সে জবাব দেয়, ওরা বোকার মত মারামারি করলে আমি কি করব? একজন ছবি দেখাতে নিয়ে গেলে আরেকজন তাকে শাসায় মাথা ফাটিয়ে দেবে বলে। তুই টিকিট কেটে নিয়ে আয়, কফি হাউসে খাওয়া, তোর সঙ্গে ছবি দেখে আসব, বললে বোকার মত বলে ওর সঙ্গে যাবে কেন? এতে রাগ হয় না বলো তো? পয়সা খরচ করবার মুরোদ নাই, রাগ আছে শুধু! করুক না মারামারি নিজেদের মধ্যে, আমার কাছে ট্যাফোঁ করতে এলে জুতো পেটা করে দেব।

প্রেমের গতি বিচিত্র। যারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছিল

বোকার মত তাদের মধ্যে দু'একজন শাসিয়ে দিল শিবানীকে এসিড বালব ছুঁড়ে তার দেমাক ভাঙ্গবে। দু'চারটে ঢিল পড়তে শুরু করল বাড়ীতে।

ইন্দ্রাণীর কানে কথাটা আসতে সে দুই দাদার সঙ্গে দেখা করে অবস্থা জানাল এবং দু'বোনকে কলেজে যাবার সময়ে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। বড়দাদা ইন্দ্রাণীর অনুরোধে শিবানীকে নিজের বাড়ীতে রাখতে স্বীকার করেছিলেন। তাকে নিয়ে যাবার আগে পল্লীর ডিফেন্স পার্টি এসিড বালব সমেত দু'টি প্রেমিককে ধরে ভাল করে ধোলাই করে পুলিশের হাতে দিয়ে দিল।

খবর পেয়ে দাদারা বাড়ীতে এসে দু'বোনকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দুই বৌদিদির হাতে দু'টির ভার দিলেন। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হল কলেজের খরচ সে চালাবে, খাই খরচ তাঁরা দেবেন।

পথের ধারে "শ্রীনৃসিংহদেবগড় শ্রী" টেলরিং সপে সমরলিপ্সু প্রেমিকদের মধ্যে সেদিন অনেকক্ষণ আলোচনা চলল এই সব অন্যায় অবিচারের জন্য কাকে শাস্তি এবং কি শাস্তি দেয়া সঙ্গত। কোন মীমাংসায় আসা সম্ভব হল না অনেক রাত পর্যন্ত তর্কবিতর্ক করে।

সেই রাত্রে কারা আগুন লাগিয়ে দোকানটি একেবারে ছাই করে দিল।

দুই বোনকে বাড়ী থেকে সরিয়ে দিতে পেরে ইন্দ্রাণী খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। বড়দাদাকে অনুরোধ করল শিবানীর বিয়ের চেষ্টা করতে। বি. এ. টা পাশ করলে তার বিয়ে দিতে হবে।

বাড়ী থেকে দুই বোন চলে যাওয়াতে সংসারের কাজের চাপ কিছু বাড়ল ইন্দ্রাণীর। পিসীর কথার ধারও কিছু বাড়ল। এ সব গ্রাহ্য করত না সে। নানা ঝামেলার মধ্যে সময় করে নিয়ে একটু একটু করে থিসিস লিখতে আরম্ভ করল।

সংসারের নানা রকমের কাজ করছে, কলেজে যাচ্ছে, বোনেদের খরচ যোগাবার জন্য টিউশনি করছে, কোচিং ক্লাস নিচ্ছে, ডাঃ চ্যাটার্জির তাড়ায় একটু একটু করে থিসিস লিখছে ইন্দ্রাণী। বাইরে

থেকে শুনলে, চোখে দেখলে, ভাবলে মনে হবে নীরন্ধ্র, নিরেট, কর্মময় জীবন তার।

কিন্তু রন্ধ্র একটি ছিল এবং ইন্দ্রাণী হয়ত স্বীকার করবে না রন্ধ্রটি ক্রমে বড় হচ্ছিল। এই রন্ধ্র-পথে নিরেট, কর্মব্যস্ত জীবনে হাওয়া ও আলোর স্পর্শ লাগছিল।

বলা বাহুল্য, এই রন্ধ্র ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয়।

লেবরেটরী ঘরে বসে তাঁর মুখে বায়োকেমিষ্ট্রির কথা শোনবার পরে প্রায় দু'মাস কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি, কথাবার্তা হয়নি। অবশ্য যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে সে তাঁকে দেখেছে। তাঁর বাড়ীতে যাবার ইচ্ছা যে একদিনও হয়নি তা নয়, কিন্তু ইন্দ্রাণী যায়নি।

অনেক ভেবে যাবার ইচ্ছাকে শাসন করেছে সে। কেন শাসন করতে হল?

অতি ভদ্র, মার্জিত, সহৃদয় তাঁর ব্যবহার, শান্ত, গম্ভীর, প্রসন্ন চেহারা। জৈব-বিজ্ঞানে অজ্ঞ তার মত ইতিহাসের ছাত্রীকে অল্প কথায়, প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন তাঁর অধীত বিজ্ঞানের মূল কথা। আবার তাকে যেতে নিমন্ত্রণ করেছেন অনুগ্রহ করে। সব সত্যি। এটাও সত্যি যে যাবার ইচ্ছা হয়েছে তার মনে। ইচ্ছাকে সে চেপে রেখেছে কারণ তার মনে হয়েছে নিজের অর্বাচীন কৌতূহল মেটাবার জন্য তাঁর সহজ ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করা, কাজের ব্যাঘাত করা অন্যায়।

পেনের উল্টো দিক দিয়ে নিজের কপালে দাগ কাটে ইন্দ্রাণী, ঘন ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হয়, নিজের মনকে অসন্তোষের দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করে প্রশ্ন করে, শুধু জৈব-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা শোনবার কৌতূহল মেটাবার জন্য যেতে চাও তুমি, না আর কোন ইচ্ছা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে এই কৌতূহলের মধ্যে? খোঁচা খেয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মন বলে স্বীকার করছি ডাঃ চক্রবর্তীর কথা শুনতে বেশ ভাল লাগে, সেটা তাঁর বলবার ষ্টাইলের গুণ; এ ভাল লাগাকে কি

এক্সট্রা-য়্যাকাডেমিক ব্যাপার বলতে চাও? বড় খুঁতখুতে স্বভাবের মেয়ে তুমি ইন্দ্রাণী।

হয়ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের বলে, খানিকটা নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ-প্রবণ, সতর্ক মেয়ে বলে, শাদা কথায় খানিকটা জিদ করে ইন্দ্রাণী যায় না ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ীতে।

কলেজের কাজ, নিজের পড়াশোনার, সংসারে কাজের চাপও ছিল।

খাঁচায় আবদ্ধ টিয়া পাখীর মত বাটিব·ছোলা খুঁটে খুঁটে খেয়ে, রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিয়ে, দু'চার বার ডানা ঝাপ্টে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছিল ইন্দ্রাণী। খাঁচার বাইরে মুক্ত আকাশ, সবুজ বৃক্ষ-শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে জীবনের দার্শনিক তত্ত্বের কথা ভাবে না খাঁচার টিয়া পাখী, ইন্দ্রাণীও ভাবত না। মুক্ত আকাশ, সবুজ গাছপালা খাঁচার বাইরে রয়েছে তো রয়েছে।

রয়েছে তো রয়েছে বলে চোখ বুঁজে মনকে বস্তা চাপা দিয়ে রাখতে পারলে হয়ত ভালই হত ইন্দ্রাণী ভাবে। কোন দিক দিয়ে ভাল হত তার অর্থ নিয়ে ছোটখাট গোলমালের হাওয়া ঢুকেছিল তার মনে।

শনিবারে দু'টো মাত্র ক্লাস একটা থেকে তিনটের মধ্যে।

ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। ঘেমে নেয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে বাসষ্টপে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী। তোয়ালে দরকার, এক টুকরো রুমাল নিয়ে ঘাম মুছতে লাগল। গাড়ীর দেখা নাই, রোদ্দুরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে?

মিনিট দুই পরে নৃসিংহগড়ের রাস্তা ধরে একখানা প্রাইভেট গাড়ী বাসের রাস্তায় পড়ে বাঁদিকে ঘুরতে গিয়ে থেমে গেল।

একটি ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে লম্বা পা ফেলে বাসষ্টপে এসে কাছে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলেন, ক্ষুদে রুমাল দিয়ে ঘামে ভেজা কপাল, মুখ, গলা মোছবার চেষ্টা করতে দেখলেন, তারপর তার ব্যাগটা টেনে নিয়ে বললেন, আসুন।

অধ্যাপিকার রোদে রাঙা মুখ বুঝি আর একটু রাঙা হল ভদ্র-লোকটির এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে।

ভেতরের সীটে একটা এটাচি কেস ছিল, সরিয়ে নিয়ে বসতে বললেন ইন্দ্রাণীকে। এটাচি কেস খুলে একখানা ধোয়া, ভাঁজ করা তোয়ালে বের করে তার সামনে ধরলেন, এইটে কাজে লাগান।

এটাচি কেস বন্ধ করে নীচে রেখে সামনের সীটে গিয়ে বসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।

শহরের মধ্যে ঢুকে এক জায়গায় গাড়ী বেঁধে নেমে গেলেন ভদ্র-লোক, বললেন, আসছি।

একটু পরে দু'হাতে দু'টো ঠাণ্ডা অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে ফিরলেন, একটা ইন্দ্রাণীর সামনে ধরে বললেন, খেয়ে নিন, আমিও খাচ্ছি।

বোতল ফেরৎ দিয়ে এসে বললেন, এবার বলুন তো আপনার কলেজটা কোথায়?

এখানে ছেড়ে দিন, ট্রামে চলে যাব, ইন্দ্রাণী বলল, নামবার উদ্যম করল।

বসুন। কলেজ কোথায় বলেননি এখনও।

রাস্তার নাম বলল।

কাছে তা হলে। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যাব ঐ পথে।

ডাঃ চক্রবর্তী, তোয়ালেটা আমার ব্যাগে পুরে নিচ্ছি, কেচে ফেরৎ দেব।

আমার দরকার হবে ওটা, এটাচি কেস খুলে রেখে দিন।

কলেজের সামনে ইন্দ্রাণীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন ডাঃ চক্রবর্তী। যাবার সময় বললেন, কাল রবিবার, যদি অসুবিধা না থাকে আসবেন বিকেলের দিকে।

তিনটায় ক্লাশ শেষ হলেও আরও একঘণ্টা ইন্দ্রাণী বসে রইল কলেজে, রোদ না কমলে বেরোনো যাবে না। কলেজের ছোট টিচারর্স রুমের এক কোণে বসে এলোমেলো নানা কথা ভাবতে লাগল।

ডাঃ চক্রবর্তীর আজকার ব্যবহারকে কি বলতে হবে, কি বলা যায়? সহৃদয় ভদ্রতা না শিভ্যালরি? শিভ্যালরির যুগ অনেক দিন আগে শেষ হয়নি কি? কে জানে? শেষ হয়ে থাকলে কি নৃসিংহগড়ের বাসষ্টপে তার দেখা পাওয়া যেত?

হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে লিফট্ দেয়ার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, গরমে ঘর্মাক্ত একটি মহিলাকে গায়ের ঘাম মোছবার জন্য বাক্স খুলে নিজের তোয়ালে এগিয়ে দেয়া কি শিভ্যালরির কোডের মধ্যে পড়ে? পথের মধ্যে গাড়ী থামিয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ কিনে খাওয়ানো তার কোডের মধ্যে পড়ে কি?

এ সবের কি মানে করা যেতে পারে? বুঝতে পারছে না সে।

নিস্পৃহ, উদাসীন, মার্জিত ভদ্রতার দেয়াল ভেঙ্গে পড়ল না কি তাকে বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে রোদে ঘামতে দেখে?

নিজের ওপরে চটে উঠল ইন্দ্রাণী এতক্ষণ পরে। বড় ছোট, বড় ভালগার মন হয়েছে তার। খানিকটা আলাপ করে, তাঁর সম্বন্ধে খানিকটা গল্প শুনে ডাঃ চক্রবর্তীকে সে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে, ভাবছে না কি? ব্যাপার এত কিছু ঘোরাল নয় মোটেই। তাঁর সম্বন্ধে হয়ত বাড়িয়ে বলা ভাল কথা কিছু শুনেছেন মেসোমশায়ের কাছে। মন কিছুটা তৈরী হয়েছিল তার অনুকূলে। বাকীটা তার ভদ্র, সহৃদয় অন্তঃকরণের পরিচয়। তার নিজের মধ্যে কোথায় একটু গোলমালের আভাস পেয়ে সে এমন করছে। যেদিন তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিল সেদিন তো সব সহজ ছিল, অসহজ হল কেন আজ? তাঁর সব ব্যবহারের চুলচেরা বিশ্লেষণ করবার কথা মাথায় ঢুকতে দিয়ে অন্যায় করেছে সে। তাঁকে একটু ভাল লেগেছে এজন্য নিজের মনের বাক্স খুলে সব তছনছ করে হাতড়ে দেখবার উদ্যম বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

এই বাড়াবাড়ি করবার উদ্যম বন্ধ করতে হবে। ডাঃ চক্রবর্তী শুধু বিখ্যাত বিজ্ঞানী নন, একজন পারফেক্ট, ভাল. ভদ্রলোক।

তাঁর বন্ধুত্ব মূল্যবান জিনিস। ভাল লোককে কিছু ভাল লাগা

স্বাভাবিক, যুক্তি-সঙ্গত ব্যাপার, তার মধ্যে এত ফেনা উঠতে দিচ্ছে কেন সে ?

পরদিন রবিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফটকের লোহার দরজায় হাত রাখতে নেপালী দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে এসে ফটক খুলে দিল, সেলাম করল ইন্দ্রাণীকে।

হল্‌দে নুড়ি বিছানো পথে খানিকটা যেতে শাদা কুকুরটা ডাকতে শুরু করল। সেই ফাঁকে পাথরের নুড়ি বিছানো পথের ধারে একটা রজনীগন্ধার ডাঁটা থেকে দু'টো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে চুলে পরল ইন্দ্রাণী। ইচ্ছে হল পরে নিল, কিসের কি মানে হয় একটুকুও না ভেবে !

তাকিয়ে দেখল ডাঃ চক্রবর্তী বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন। বললেন, আসুন মিস্ সান্যাল।

হাসিমুখে নমস্কার করল ইন্দ্রাণী বারান্দায় উঠে, বলল, আপনি আসতে বলেছিলেন, এই এলাম।

বেশ করেছেন।

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সামনা সামনি, একটু পরে পাশে সরে গেল খানিকটা, বলল, কিছু মনে করবেন না। আমি খাটো নই, কিন্তু আপনার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকটা ছোট বলে মনে হল নিজেকে, তাই সরে দাঁড়ালাম ইনফিরিয়োরিটি কমপ্লেক্স তাড়াবার জন্য। অন্তত প্রোফেশনালি উই আর অন দি সেম ফুটিং।

হাসলেন একটু, বললেন, এক মিনিট বসুন।

এক গোছা রজনীগন্ধা এনে সামনে ধরলেন, চুলে পরুন, ঐ ঘরটাতে আয়না আছে !

হাঁ করে তাকাল ইন্দ্রাণী ডাঃ চক্রবর্তীর দিকে মনে মনে, বাইরে নয়। বাইরে অন্য রকম করল। ফুলের গোছা হাতে নিয়ে চলে গেল নির্দিষ্ট ঘরে, ধন্যবাদ দিয়ে !

ফুল পরা হয়ে গেলেও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রাণী। নিজের রূপ নিরীক্ষণ করছিল না দাঁড়িয়ে, দেখছিল গালের অসভ্য লালটুকু মিলিয়ে গেল কিনা।

ভদ্রলোক এমন এক কাণ্ড করে বসলেন হঠাৎ যে গাল লাল করতে অনভ্যস্ত অধ্যাপিকার গাল লাল হয়ে উঠল।

মিনিট পাঁচ বোধ হয় দাঁড়িয়েছিল। ডাঃ চক্রবর্তী বাইরে থেকে ডাকলেন, মিস্ সান্যাল, চা দিতে বলেছি, বেরোবেন কি দয়া করে ?

বেরিয়ে এল, বলল, প্লিজ বলবেন না কেমন দেখাচ্ছে। বেশ দেখাচ্ছে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কি না।

মনের ভাব দেখে নিন্ ভদ্রলোক তাকে অপ্রতিভ করা সহজ নয়।

মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন, বললেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য। ঐ দিকটাতে চলুন, বসবেন। পাখাটা খুলে দিই ?

ফুলগুলো পড়ে যাক চুল থেকে চাইছেন মনে করব কি ?

না চাইছিনা। তাহলে বারান্দায় চলুন। এখানে গরম লাগবে।

দেখুন, বুড়ো বয়সে ফুল পরেছি আপনি হাতে করে দিলেন বলে। রাস্তার লোককেও ফুলপরা চেহারা দেখাতে হবে না কি ? আমি অতটা উদার মনের মেয়ে নই।

মিষ্টি করে হেসে ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, বেশ, তাহলে এখানেই বসা যাক।

চা খেতে খেতে ইন্দ্রাণী বলল, ডাঃ চক্রবর্তী, যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রার্থনা জানাতে চাই।

কি বলুন তো ?

একটু বাজনা শুনতে চাইলে ধৃষ্টতা করা হবে কি ?

আচ্ছা, চা খেয়ে নিন তো।

সপ্রতিভ দেখাবার তাগিদে নিজেকে যেন স্থির রাখতে পারছিল না ইন্দ্রাণী। চা খাওয়া শেষ না হতে আবার বলল, সেদিন জেনেটিক কোডের কথা বলছিলেন, জিনিসটা যদি অনুগ্রহ করে আর একটু বুঝিয়ে দেন—

তাকালেন ইন্দ্রাণীর দিকে, বললেন, বুঝিয়ে দেব।

ভারি নরম একটা ভাব লেগে রয়েছে দৃষ্টিতে ইন্দ্রাণীর মনে হল।

তারপর হেসে বললেন, বিজ্ঞানের কথা শোনবার সময়ে মনকে

শান্ত, সংযত, প্রসন্ন করে নিতে হয়, যেমন দেব পূজার সময়ে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবার সময়ে করে নিতে হয়।

প্রতিজ্ঞা করেছিল মাথা নামাবে না, মাথা নামাল ইন্দ্রাণী।

বাজনা শুনবেন একটু। অন্ধকার হয়ে আসছে, বারান্দায় বসতে আপত্তি হবে কি ?

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী।

ঘরে গিয়ে ঢাকা দেয়া এসরাজ নিয়ে এলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বাজালেন এসরাজ।

আধা-অন্ধকারে চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপরে দু'হাত রেখে চুপ করে শুনতে লাগল ইন্দ্রাণী।

কখন সুরের মধ্যে ডুবে গেল ধীরে ধীরে জানে না সে। ডুবে গেল সুরের মধ্যে সব কিছু ভুলে। অদ্ভুত, নূতন একটা আলোড়ন শুরু হয়েছিল বুকের মধ্যে, সে বুঝি ভেঙ্গে গেল, ছিঁড়ে গেল, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল আকাশে, বাতাসে। তারপর কখন এক সময়ে সব শান্ত হয়ে এল। ধীরে ধীরে নির্মল প্রসন্ন আলোকে পূর্ণ হয়ে উঠল তিন ভুবন।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

বাজনা বন্ধ হল। এক ফাঁকে চোখ মুছে ফেলল।

অতি মৃদুস্বরে ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, মাধবী বড় ভালবাসত যে বাজনা শুনলেন। অনেক দিন এটা বাজাইনি।

কিছুক্ষণ পরে বরফ দেয়া দু'কাপ ঠাণ্ডা কফি এল দু'জনের জন্য।

কফি খাওয়া হলে ডাঃ চক্রবর্ত্তী বললেন, রাত হয়েছে, চলুন কিছুদূর যাই আপনার সঙ্গে।

কাউকে সঙ্গে দিন।

আচ্ছা।

একটা ইচ্ছে হয়েছে মনে, দু'তিন পা এগিয়ে গেল ইন্দ্রাণী, নত হয়ে প্রণাম করল পায়ে হাত দিয়ে। মাথার ফুলগুলো খুলে মাটিতে রাখল।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে মানিয়ে ছিল হয়ত, বাইরে মানাবে না, তাই রেখে গেলাম। আজ আসি তাহলে ?

ফুলগুলো কুড়িয়ে নিলেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী ইন্দ্রাণী দেখল, বললেন, আচ্ছা, আসুন। ফটক পর্যন্ত গিয়ে দারোয়ানকে আদেশ দিলেন ইন্দ্রাণীকে বাড়ী পৌঁছে দিতে।

বাড়ী ফেরবার পরে ঘণ্টা দুই সময়, কিছু কাজ সেরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত, একটা মিষ্টি নেশার মধ্যে কেটে গেল। শেষ রাত্রের দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন উঠল, কাল বিকেল বেলা কি হয়েছিল তার ? একটা একটা করে সবগুলো ঘটনা মনে করতে লাগল। লজ্জার মাথা খেয়ে মাথায় ফুল গুঁজে নিজের রূপ নিয়ে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে গেল কি করে সে ? এটা কোন্ শ্রেণীর দুর্বলতা ? বাজনা শুনে তার মন বিকল হয়েছিল। এটা মার্জনীয়, সত্যি অপূর্ব বাজনা। প্রণাম করেছিল তাঁকে যাঁর অনুগ্রহে এই অপূর্ব বাজনা শোনবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। এটাও মার্জনীয় ! অমার্জনীয় তার প্রথম দিকের দুর্বলতা। এ দুর্বলতাকে ভদ্রলোক কি ভাবে দেখলেন সে জানে না, জানবার চেষ্টাও করেনি। অদৃশ্য রজ্জুর আকর্ষণে সে পুতুল নাচের পুতুলের মত অভিনয় করেছে। পুতুলের বোধ নাই সে অভিনয় করছে, তারও সে বোধ ছিল না। অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকম করে, বার বার বিছানায় এপাশ ওপাশ করে, সে ভাবতে লাগল। শেষে নিজের মনে বলল, অনেক দুর্বলতা সে কাটিয়ে উঠেছে তার জীবনে, এ দুর্বলতাও সে কাটিয়ে উঠবে। অনেক খাটতে হবে তাকে জীবনে একটু সচ্ছলতা আনবার জন্য, একটু অবসর পাবার জন্য। সচ্ছলতা আসলে, অবসর পেলে, নিজের ইচ্ছামত পড়া শোনা করতে পারবে সে। নিজেকে সম্বোধন করে বলল, ইন্দ্রাণী, ছেলেমানুষির প্রশ্রয় দেবার মত বয়স চলে গিয়েছে তোমার, সাবধান হতে শেখো। হাঁ সাবধান হবে সে এখন থেকে।

৫

কখনো দুর্বোধ্য কখনো অবাধ্য মন এবং প্রতিকূল ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাকে পথ চলতে হয় তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করবার মত কত ব্যাপার যে রয়েছে সংসারে।

অনিমেষ আবার চিঠি লিখেছে।

দিল্লীর আবহাওয়া সত্যি তার সহ্য হল না, ভাল চাকুরিটা ছেড়ে দিয়ে সে গুজরাটে চলে গিয়েছে চাকুরি নিয়ে। সেখানকার আবহাওয়াও ভাল লাগছে না, ভাবছে আর কিছুদিন দেখে কলকাতায় চলে যাবে। একটা কথাবার্তা চলছে, সুবিধা দেখলে দেশের বাইরে চলে যাবার ইচ্ছাও আছে।

লিখেছে, হয়ত দেশের বাইরেই যাব। সারা দেশের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারছি। আগের জেনারেশনে দেশে যে সব মানুষ ছিল তাদের গোষ্ঠী কি লোপ পেয়েছে? যারা আছে এখন তারা কারা? কোথায় থেকে এত হিপোক্রিসি, শঠতা খুনীর মনোভাব এল তাদের মধ্যে? কি সূত্রে এল, কাদের এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে ভাবি গালে হাত দিয়ে বসে। ভাবনার সূত্রে যা চোখে পড়ে প্রকাশ করে তা বলবার সাহস নাই। হেমলকের রস দুষ্প্রাপ্য হতে পারে, সোডার বোতল, ও ইট পাটকেল তো দুষ্প্রাপ্য নয়।

আরও অনেক কথা লিখেছে অনিমেষ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে, ইণ্টেলেকচুয়ালদের অবস্থা সম্বন্ধে।

শেষে লিখেছে ইন্দ্রাণীকে সে ভালবাসে। লিখেছে, একটি ছেলে একটি মেয়েকে, যত একমপ্লিশড, পণ্ডিত হোক না সে, ভালবাসলে, তাকে পেতে চায়। পেতে চায় মানে আর দশটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যহীন, অপণ্ডিত মেয়ের কাছে যা পাওয়া যায় তাই পেতে

চায়, ভালবাসা, সঙ্গ, সন্তান। আমি তোমার কাছে কিছু না চেয়েও তোমাকে ভালবাসি। ইট ইজ লাইক ফলিং ইন লাভ উইথ এ ফাইন পিকচার অব এ ওম্যান। কোন প্রত্যাশা না করেও তোমাকে আমি ভালবাসি, কারণ, আমি জানি তোমার কেরিয়ার যাতে নষ্ট হয় এমন কিছু কখনও কেউ পাবে না তোমার কাছে। ইউ আর এভার রেডি টু স্যাক্রিফাইস ইওর ওম্যানহুড টু ইওর কেরিয়ার।

দেখলে তো আমার সাহস কত বেড়েছে? মুখের ওপরে না হোক কলমের মুখে বলে দিলাম আমি তোমাকে ভালবাসি ইন্দ্রাণী। এ কথা পড়ে তুমি বিদ্রূপ করবে না জানি, জোরে হেসে উঠবে না এটাও জানি, অতটা বর্বর উৎকর্ষের স্তরে ওঠবার প্রতিভা তোমার নাই, শুধু একটু মিষ্টি করে হেসো।

হাসলে একথা জানিয়ে চিঠি উত্তর দেবে কিনা বলতে পারছি না।

ক'দিন পরে অনিমেষের চিঠির উত্তর দিল ইন্দ্রাণী।

লিখল, তোমার চিঠি পেয়েছি। অনিমেষ লক্ষ্মীটি, এ রকম চিঠি আমাকে আর লিখো না তুমি।

তুমি যে অভিযোগ করেছ আমার বিরুদ্ধে হয়ত সেটা সত্যি। আমার মত দুঃখ, কষ্ট, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তোমাকে মানুষ হতে হয়নি, আমার অবস্থা তুমি বুঝতে পারবে না।

আমাদের দলের মধ্যে সব চেয়ে ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র তুমি, ডাঃ চ্যাটার্জির আশা নিউ স্কুলের সব চাইতে বড় ঐতিহাসিক হবে তুমি। সেন্টিমেন্টকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন? ও জিনিষকে বাড়তে দিলে অযথা দুঃখ বাড়ে, সত্যিকার কাজের ব্যাঘাত ঘটে।

যদি মনে হয় বিয়ে করলে তোমার মন শান্ত হবে, তুমি কাজ করতে পারবে, একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলো। ভালবাসার বাড়াবাড়ি না থাকলে কি আসে যায় জীবনে?

আমি মিষ্টি করে হেসেছি অনিমেষ, তোমার কথা মনে হলে

নিজের অজ্ঞাতসারে মিষ্টি হাসি এসে পড়ে আমার মুখে। নিউ স্কুল অব হিষ্ট্রীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হবে তুমি, তোমার জন্য এ হাসি রির্জাভ করা রয়েছে।

বিদেশে যাওয়া হলে একটু খবর দিয়ো।

অন্য একটি মেয়ে কলেজে চাকুরির দরখাস্ত করেছিল ইন্দ্রাণী ডাঃ চ্যাটার্জিকে জানিয়েছিল। ক'দিন পরে তিনি খবর দিলেন ইন্দ্রাণীকে দেখা করবার জন্য।

কলেজ ফেরৎ তাঁর বাড়ীতে গেল ইন্দ্রাণী।

বাইরের কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন দেখা করতে, ইন্দ্রাণী মাসীমার ঘরে ঢুকল। ঘর খালি। মাসীমার মেয়ে অপু ইন্দ্রাণীকে দেখে খাবার ঘরে মাকে খবর দিতে দৌড়ল। অতিথিদের জন্য চা, খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন তিনি। বললেন, ইন্দ্রাণীকে নিয়ে আয় এখানে। কলেজ থেকে ফিরছে, খিদে পেয়েছে ওর।

অপুর সঙ্গে ইন্দ্রাণী আসতে বললেন, হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে আগে।

খেতে খেতে ইন্দ্রাণী মাসীমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল।

ছু'টো রবিবার এলি না এখানে, কি মহাকাজে ব্যস্ত ছিলি ?

মেসোমশায়ের তাড়ায় থিসিস লেখায় হাত দিয়েছি মাসীমা। কিন্তু অন্য দিনগুলোয় এত খাটতে হয় যে সময় করতে পারি না। তাই রবিবারে—

অত বেশী খাটবি না ইন্দ্রাণী, যা চেহারা করেছিস খেটে খেটে।

মাসীমার কথা শুনে শুধু একটু হাসল ইন্দ্রাণী। সে জানে প্রতিবাদ করে সে যদি বলে খেটে খেটে এমন চেহারা হয়নি, তার চেহারা বরাবর এ রকম, মাসীমা এমন সব কথা বলতে আরম্ভ করবেন যে একটা কথারও জবাব খুঁজে পাবে না ইন্দ্রাণী।

বলল, আচ্ছা মেসোমশাইকে বলব থিসিস হবে না আমার দ্বারা, চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

হেসে মাসীমা বললেন, তার মানে মাসীর কথা মেসোকে

লাগাবি ? কোন সুবিধে হবে না বাপু তাতে। তার চাইতে অল্প অল্প করে খেটে—আচ্ছা, তিন চার মাস এ বাড়ীতে থেকে কাজটা শেষ করবার কথা বলেছিলাম কানে নিচ্ছিস না কেন কথাটা ?

আমার কাজগুলো তো আমাকে করতে হবে মাসীমা। সেই কাজ থেকে ফালতু পয়সা আসে সকলের দাবি মেটাবার জন্য। দেখি নূতন একটা কাজের চেষ্টা করছি—

অন্য কথা তুললেন মাসীমা, বললেন, গেল রবিবারে ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা দু'জন। কি সুন্দর বাগান করেছেন দেখেছিস ? বাজনা শোনালেন দয়া করে। কি অপূর্ব বাজনা ! এই বয়সে কান্না পেল বাজনা শুনে। মোটা দাম দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনেছেন লেবরেটরীর জন্য। তুই দেখেছিস সব, না ?

হ্যাঁ, কিছু দেখেছি, একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাসীমার দিকে তাকিয়ে সতর্ক জবাব দিল ইন্দ্রাণী।

ডাঃ চক্রবর্তীর কথা চালাতে লাগলেন মাসীমা, কি চমৎকার স্বভাবের মানুষ, একটা ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করা দরকার তাঁর। দেখাশোনা করবার কেউ কাছে না থাকলে কাজ করবেন কি করে ? পারতেন তোর মেসোমশাই এত নাম করতে সময়মত খাইয়ে পরিয়ে হাসি গল্প করে তাঁকে চালু না রাখলে ?

খবর এল বাইরের ভদ্রলোকেরা চলে গেলেন।

ইন্দ্রাণীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, খবর পেয়ে সে উঠে পড়ল।

সিগার ধরাচ্ছিলেন ডাঃ চ্যাটার্জি, ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকতে বললেন, কতক্ষণ এসেছ ? ব'সো। মাসীমা খাইয়ে দিয়েছেন কি ?

হেসে ইন্দ্রাণী বলল, পেট ভরে খাইয়ে দিয়েছেন। এতক্ষণ গল্প করছিলাম তাঁর সঙ্গে।

তারপর তোমার কাজ কতটা এগোলো বল। এই জন্য ডেকেছি।

ইন্দ্রাণী জানে এজন্য ডাকেন নি। সে কথা না বলে বলল, কাজ এগোচ্ছে না বিশেষ। তাড়াতাড়ি কাজ করতে হলে যতটা ফালতু সময় হাতে থাকা প্রয়োজন, যতটা মনের স্বাচ্ছন্দ্য—

বাধা দিলেন প্রাক্তন ছাত্রীকে, মনের স্বাচ্ছন্দ্য? হোয়াট ডাজ ইট মিন? মনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে এমন কোন ব্যাপার—

খোঁচাটুকু উপেক্ষা করে ইন্দ্রাণী বলছিল সংসারের ছোট বড় ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক—

সে সব তো অনেক কাল ধরে পোয়াচ্ছ তুমি। তার চাইতে তোমার মাসীমার সঙ্গে কথা বলে এখানে মাস তিন চার থেকে লেখাটা শেষ করে ফেলবার কথা ভাবো। কবে অমাবস্যায় ষোল কলার চাঁদ উঠবে তখন আমি হাসব, এ রকম ভাবলে এ সব কাজ করা চলে না।

সিগার নিভে গিয়েছিল, আবার ধরালেন, বললেন, বাই দি বাই, ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছে বায়োকেমিষ্ট্রীর পাঠ নিচ্ছ শুনলাম। নিজের কাজ ছেড়ে বায়োকেমিষ্ট্রী মাথায় ঢুকতে দিলে—

আধ ঘণ্টা মত সময় তিনি অনুগ্রহ করে বলেছিলেন কিছু।

অত সিরীয়াসলি নিচ্ছ কেন কথাটা? তাঁর কাছে তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শোনবার সুযোগ পেয়েছ, দ্যাট ইজ এ বিগ থিং।

তারপর একটু হেসে বললেন, ডাঃ চক্রবর্তীর এট্রাকটিভ পার্সোনালিটি আছে, জীবন-কাহিনীর একটা লিরিক্যাল এপিল রয়েছে মেয়েদের কাছে, আমেরিকানদের ভাষায় তিনি একজন 'ডেডিকেটেড' ম্যান। ভাল আইডিয়াকে, ভাল কথাকে ভালগারাইজ করবার জুড়ি নাই আমেরিকানদের।

ইন্দ্রাণী চুপ করে শুনছিল। মনে হল কোন একটা কথা বলতে চান মেসোমশাই, সোজা কথায় না বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন।

চমৎকার এসরাজ বাজাবার হাত ডাঃ চক্রবর্তীর, কি বল? প্রশ্ন করলেন হঠাৎ।

হ্যাঁ, চমৎকার বাজান।

ওঁর বাজনা শুনে আমার মনের মধ্যে কেমন করে।

ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে বলল, আমারও কেমন করেছিল।

আরে বাপস্, কি দারুণ কাটা কাটা জবাব দিচ্ছ। তোমার মাসীমাকে বলতে হচ্ছে।

না মেসোমশাই, বলবেন না।

আচ্ছা, আচ্ছা, বলব না।

তারপর বললেন, এবার কাজের কথা শোন। তোমার যতটা লেখা হয়েছেআমাকে দিয়ে যাবে দিন পনেরো পরে, একটা শেপের মধ্যে আনবার চেষ্টা করব, তুমি বাকীটা লিখতে শুরু করো। একটু তাড়াতাড়ি করতে পারলে—

আমাকে বিকেলে কোচিং ক্লাস নিতে হয়। সকালে টিউশানি—

কি পর্বতপ্রমাণ ভার তোমাকে বইতে হয় ভুলে যাই তোমাকে দিয়ে বড় একটা কাজ করিয়ে নেবার আগ্রহে।

যে কাজটার কথা বলেছিলাম আপনাকে, কিছু টাকা বেশী পেলে হয়ত—ইন্দ্রাণী বলছিল।

এই দেখো, আসল কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। ওদের লোক এসেছিল আমার কাছে। পয়সা দেবার বেলায় সব কর্তা সমান। বললে এখন সব নিয়ে সওয়া তিনশো মত হবে, ছ'মাস পরে আর কিছু দেওয়া সম্ভব কিনা বিবেচনা করবে। যদি সুবিধে মনে কর নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দিতে বলব, সেটা পেলে এখনকার কলেজে নোটিশ দিয়ো।

বেশী সুবিধের না হলেও নিতে রাজি আছি। টিউশানি বন্ধ করলে কিছু সময় পাওয়া যাবে কাজ করবার।

হেসে বললেন, আমার কাছে শুনেছে তুমি ডকটরেটের জন্য থিসিস দিচ্ছ, আগ্রহ দেখালো। এবার একটু মন দিয়ে কাজ করো।

তাহলে কাল ওদের খবর দেবো।

কাজের কথা শেষ হলে নিজের কথা বলছিল ইন্দ্রাণী। বলছিল, খেটে যাচ্ছি মেসোমশাই কিন্তু উৎসাহ থাকছে না যখন দেশের মধ্যে চার পাশে যা ঘটেছে চোখে পড়ে। ঘর গুছিয়ে নেবার শক্তি নাই,

দেশের লোকের মনে উৎসাহ আনবার বুদ্ধি নাই, শুধু বড় বড় কথার তুবড়ি জ্বালানো, গরীব দেশবাসীর কষ্টের টাকা দু'হাতে ওড়ানো হচ্ছে, বড় বড় স্কীম করা হচ্ছে, বেপরোয়া হয়ে দেনা করা হচ্ছে,—থেমে গেল হঠাৎ মেসোমশাইয়ের দিকে চোখ পড়তে।

তুমি চটে গেছ ইন্দ্রাণী ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন। ঐতিহাসিকের চটে গেলে চলবে না। তার কাজ—

ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজল।

অধ্যাপক গৃহিণী ঘরে ঢুকলেন। ওকে আর আটকে রাখছ কি বলে? অনেক রাত হয়ে যাবে বাড়ী ফিরতে।

অপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ চ্যাটার্জি, বললেন, তাইতো, খেয়াল ছিল না। ওর বাড়ীতে খবর দেবার উপায় থাকলে থেকে যেতে পারত। দেখো যদি ড্রাইভারকে পাওয়া যায় পৌঁছে দিয়ে আসুক।

ইন্দ্রাণী বলল, এমন কিছু রাত হয়নি মাসীমা, ঠিক চলে যাব আমি। ধমকালেন, মাসীমা, গুরুজনের অবাধ্য হয়ো না। বোস একটু, দেখছি আমি।

টেবিলের ওপর থেকে একটা চটি বই নিয়ে ডাঃ চ্যাটার্জি ইন্দ্রাণীর হাতে দিলেন। অনিমেষের এই বুলেটিন পরশুর ডাকে পেলাম, Nehru's Himalayan Blunder—India must repudiate Chinese sovereignty over Tibet,—তোমার নামে এক কপি পাঠিয়েছে।

তার নাম লেখা বইখানা ব্যাগে ভরে নিল ইন্দ্রাণী।

দিন দশ পরে নূতন কলেজের নিয়োগপত্র পেল সে।

পুরনো কলেজে নোটিশ দিয়ে দিল পরদিন।

মেজ বোন শিবানীর বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে দুদিন হল। ভাবল পরদিন রবিবারে একটু বেলা থাকতে কলকাতা যাবে, বড়দার বাড়ীতে গিয়ে খবর নেবে শিবানী কেমন পরীক্ষা দিল, তারপর ডাঃ চ্যাটার্জিকে নিয়োগপত্র পেয়েছে খবরটা দিয়ে আসবে আর থিসিসের যতটা লেখা হয়েছে দিয়ে আসবে।

সকালে চা খেয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল বড়দাদা তার ঘরে ঢুকলেন। তাঁর মুখের চেহারা দেখে মনে হল খারাপ খবর আছে।

দোর ভেজিয়ে দিয়ে বসলেন বড়দাদা। বললেন, শিবানী পালিয়েছে।

চমকে উঠল। শিবানী পালিয়েছে? কি বলছেন?

বড়দাদা বললেন, পরশুর আগের দিন পরীক্ষা শেষ হয়েছিল শিবানীর। পরশু সারাদিন বাইরে ঘুরেছে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে এখানে ওখানে যাবে বলে। কাল সকালে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে বলে, জানায় রাত্রে ফিরবে। আর বাড়ী ফেরেনি। আজ তার বিছানা বাক্স খুঁজে এই চিঠি পাওয়া গেল।

চিঠিখানা ইন্দ্রাণীর নামে, খুলে পড়া হয়েছে।

লিখেছে, পূজনীয়াসু দিদি, আমি দিল্লী যাচ্ছি আমার স্বামী সমীর বোসের সঙ্গে। তিন মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে রেজিষ্ট্রারের অফিসে। তারিখ ও ঠিকানা নীচে দিলাম, খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো ইচ্ছা হলে। বি. এ. পরীক্ষা দেব বলে আগে যাইনি। পরশু সমীর ছুটি নিয়ে দিল্লী থেকে এসেছিল আমাকে নিয়ে যেতে। দিল্লীতে সে ভাল সরকারী চাকুরি করে, মাসে সাড়ে ছ'শ টাকা মাইনে পায়। এ মাস থেকে কোয়ার্টার পাবে। পরে ঠিকানা জানাব।

কায়স্থ ছেলেকে বিয়ে করছি তোমরা বাধা দেবে, ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করছে সমীরের সেকেলে ঠাকুমা বাধা দেবেন, এজন্য গোপনে বিয়ে হয়েছে, আমাদের দু'জনের দু'চারটি বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেউ বিয়ের কথা জানে না।

সমীরের বাড়ীর অবস্থা ভাল। এম. কম. পাশ করে পরীক্ষা দিয়ে চাকুরি পেয়েছে। সচ্চরিত্র ছেলে, সিগারেট পর্যন্ত খায় না। তোমরা আমার এ রকম ভাল বিয়ে দিতে পারতে না।

আমি দেখে শুনে বিয়ে করেছি, সমীর ভালবেসে বিয়ে করেছে।

আমার কলেজের এক বান্ধবীর দাদা সমীর, আলাপ তাদের বাড়ীতে হয়। অল্প একটু চেষ্টা করতেই সে আমার ভালবাসায় পড়ে গেল। ফাজিল ফক্কড় নয়, বিয়ের কথা বলল সোজাসুজি। সমীরের বাড়ীর ঠিকানা দিলাম নীচে, ইচ্ছা হলে সব খোঁজখবর নিতে পারো। আমার বান্ধবী সমীরের বোনের নাম মালবিকা।

দিদি, ছোট বোনদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য, ভালভাবে রাখবার জন্য অনেক কষ্ট করছ তুমি, অনেক খাটছ। নিজে বিয়ে করলে না এতদিন। তোমার খাটুনি এখন থেকে কিছু কমাও। আমার অনুরোধ নিজে এবার দেখে শুনে বিয়ে করো। শর্বাণীর বিয়ের জন্য হয়ত বিশেষ কষ্ট করতে হবে না।

আমাদের দু'জনকে আশীর্বাদ ক'রো দিদি। ঠিকানা পেলে চিঠি দিয়ো।

চিঠি পড়া শেষ হলে বড়দাদাকে বলল, আপনি একবার রেজিষ্ট্রারের অফিসে ও ছেলেটির বাড়ীতে খোঁজ নিন। যা লিখেছে সত্যি হলে তেমন দুর্ভাবনা করবার কিছু নাই মনে হয়।

শেষে কায়স্থ ছেলেকে বিয়ে করল শিবানী, বড়দাদা সখেদে বললেন।

কি আর করবেন বলুন ? ভদ্রভাবে বিয়ে করেছে, এখন এইটে বিবেচনা করবার বিষয়! গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে পারত।

আমি ফিরে যাচ্ছি। তুমি বাবাকে খবর জানিয়ো।

একটু বসুন, এক কাপ চা খেয়ে যান।

বাবা ও পিসীমার সঙ্গে দেখা করলেন বড়দাদা, শিবানীর কথা কিছু ভাঙ্গলেন না। চা খাবার খেয়ে চলে গেলেন। খোঁজ নেবার কথা ইন্দ্রাণী আবার মনে করিয়ে দিল।

বড়দাদা চলে গেলে শিবানীর চিঠিখানা আবার পড়ল ইন্দ্রাণী। ভাল লাগল পড়ে। যা লিখেছে ছেলেটির সম্বন্ধে সত্যি হলে আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখবে ভাবল।

আজ আর বাইরে বেরোবে না, চুপ করে বসে কাজ করবে ঠিক করল। রোদ কমে আসতে মতের পরিবর্তন করে ছেলেটির ঠিকানা নোট বইতে লিখে নিয়ে কলকাতা যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। খোঁজ খবর তাকেই নিতে হবে, বড়দাদা হয়ত নাও নিতে পারেন।

ডাঃ চ্যাটার্জির পাড়াতে বাড়ীটা, খুঁজে বের করতে বেশী ঘুরতে হল না।

দু'টি মেয়ে বাড়ী থেকে বেরোচ্ছিল। ইন্দ্রাণী তাদের থামিয়ে বলল, এ বাড়ীতে মালবিকা বোস বলে কেউ থাকেন?

বড় মেয়েটি বলল, আমি মালবিকা। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলাপ পরিচয় চলে না, কিছুক্ষণ বসতে হবে।

মেয়েটি তাকাল ইন্দ্রাণীর দিকে, বলল, আসুন।

সঙ্গিনীকে ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে নীচের একটা ঘরে বসাল। বলল, আপনি কি শিবানীর দিদি প্রোঃ সান্যাল?

হ্যাঁ, মুখের চেহারা দেখে মনে হল, না?

মালবিকা প্রণাম করল। বলল, আপনি কেন এসেছেন বুঝতে পারছি। ঠাকুমা গোলমাল করছেন আজ সকালে দাদার চিঠিতে সব জানতে পেরে। চলুন, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কথা হবে।

কাছের একটা ছোট পার্কে বসে কথাবার্তা হল।

মালবিকা মেয়েটি ভাল। খবর যা জানবার ছিল পেল, আরও অনেক খবর পেল। বলল, তোমার ঠাকুমার গোলমাল ঠাণ্ডা হতে ক'দিন লাগতে পারে?

হেসে মালবিকা বলল, দিন দুই। তারপর হয় এখানে, নয় দিল্লীতে গিয়ে বৌভাতের ব্যাপার করবেন।

ইন্দ্রাণী বলল, আচ্ছা আজ চলি। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। শিবানী ঠিকানা পাঠালে আশীর্বাদ জানাব।

মালবিকা বলল, আসছে মাস থেকে আপনি আমাদের কলেজে আসছেন শুনতে পেলাম। সত্যি?

সেই রকম কথা তো চলছে।

মালবিকা আবার প্রণাম করল।

হাঁটতে হাঁটতে ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ীতে উপস্থিত হল।

বাড়ীর সামনে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। বুঝল বাইরের কেউ এসেছেন।

মাসীমার ঘরে ঢুকে বলল, একটু কথা ছিল মেসোমশায়ের সঙ্গে. সেরে তাড়াতাড়ি ফিরব ভেবেছিলাম, বাইরের কারা এসেছেন দেখছি।

বোস ঠাণ্ডা হয়ে, চা খা। তোর চেনা একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

আমার চেনা? কে মাসীমা?

ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী নামের একজন ভদ্রলোক। চিনিস না তাঁকে?

আমার পাড়ার লোক, চিনি মনে হচ্ছে। কতক্ষণ এসেছেন? কখন উঠবেন?

চিনিস যখন, ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে আয়। কখন উঠবেন আমি কি করে বলব?

আচ্ছা জেনে আসব। এখন একটা গল্প বলছি শুনুন।

শিবানীর কাহিনী শোনাল মাসীমাকে, মালবিকার সঙ্গে আলাপের কথাও বলল।

তারপর প্রশ্ন করল, আমাদের খুশী হওয়া উচিত কিনা বলুন?

মাসীমা বললেন, তেমন অখুশী হয়েছিস মুখ দেখে মনে হচ্ছে না। এ জিনিস হচ্ছে, ক্রমে আরও বেশী সংখ্যায় হবে, ঠেকাবার উপায় নাই। দেখতে দেখতে চালু হয়ে যাবে সমাজে। মেয়েরা একটু দেখে শুনে প্রেম করে বিয়ে করলে বাপ মায়ের দুশ্চিন্তা করবার কিছু থাকে না।

হেসে ইন্দ্রাণী বলল, যেমন আপনি করেছিলেন?

ছাখ মেয়ে, মা মাসীর প্রেমের ব্যাপার নিয়ে মুচকে হাসতে নাই। এত বড় মেয়ে হয়ে নিজের চরকায়—

অপু ঘরে ঢুকে বলল, ইণী দি, বাবা ডাকছেন তোমাকে।

আমি এসেছি কী করে জানলেন মেসোমশাই ?

আমি বলেছি তুমি মার সঙ্গে গল্প করছ।

ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকে ডাঃ চক্রবর্তীকে নমস্কার করল।

ডাঃ চক্রবর্তী উঠছিলেন, ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, বসুন আর একটু। আমার ড্রাইভার ছুটি নিয়েছে তিন দিনের, ইন্দ্রাণীকে নিয়ে যান তাড়া না থাকলে। তোমার এপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলে ?

পেয়েছি। উত্তরও দিয়েছি।

কাগজ পত্র যা আনতে বলেছিলাম এনেছ ?

ব্যাগ থেকে একটা কভার ফাইল বের করে টেবিলে রাখল ইন্দ্রাণী, বলল, টাইপ করে দিতে পারলে ভাল হত।

একবার দেখে টাইপ করিয়ে নেব! আর কোন কথা আছে ?

যা ছিল মাসীমাকে বলেছি, তাঁর কাছে শুনবেন।

কিছু খেয়েছ ?

হ্যাঁ, মাসীমা খাইয়ে দিয়েছেন।

বেশ। এবার বাড়ী যাও ডাঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে। আপনার অসুবিধা করছি না তো ডাঃ চক্রবর্তী ?

একটু হেসে উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ চক্রবর্তী, ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে বললেন, আর কিছুক্ষণ বসবেন কি ?

বসতে দেবেন না মেসোমশাই দেখছেন না ? আপনার বিশেষ কাজ আছে, অন্য জায়গায় যাবেন যদি বলেন দয়া করে—

উচ্চ হাস্য করলেন ডাঃ চ্যাটার্জি। ডাঃ চক্রবর্তীও হাসলেন।

এক মিনিট দেরি করব, মাসীমাকে বলে আসি।

ডাঃ চক্রবর্তীর পাশে বসে যেতে যেতে ইন্দ্রাণীর মনে হল তাঁকে একটু গম্ভীর দেখছে, মাঝে মাঝে দু'চারটে কথা বলছেন। যাতে অস্বস্তির ভাব না আসে এ জন্য সে নিজে কথা বলে চলল।

শিবানীর বিয়ের কথা, ছোট বোন শর্বাণীর কথা, বাতে পঙ্গু পিতার কথা, ঝগড়াটে স্বভাবের পিসীর কথা বলে গেল। নূতন কলেজের কথা, সেখানে কত বেশী পাবে, টিউশানি ছেড়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে থিসিসটা শেষ করবার ইচ্ছা, একটার পর একটা এই সব কথা বলে গেল। বলবার কি প্রয়োজন ছিল না ভেবে বলে গেল।

তাদের বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামলে বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি আমাদের বাড়ী চিনলেন কি করে? আপনার বাড়ীর সামনে নামিয়ে দেবেন ভেবেছিলাম। কিছু খেয়াল করিনি এতক্ষণ।

গাড়ী থেকে নেমে বলল, অনেক বাজে কথা বলে আপনাকে বিরক্ত করলাম আজ।

বাজে কথা বলেননি, আপনার নিজের কথা বলেছেন। আমার একটা কথা বলিনি, আমি পরশু দেশের বাইরে যাচ্ছি ছ'মাসের জন্য।

বাইরে যাচ্ছেন পরশু ছ'মাসের জন্য? কই আগে তো শুনিনি একথা?

অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, জানাবার সুযোগ হয়নি। আচ্ছা নমস্কার।

নমস্কার। এক মিনিট। সব ঠিক করে চলে যাবার সময়ে কথাটা জানালেন, আগে জানাবার ইচ্ছার চেয়ে অসুবিধা বেশী মনে হয়েছিল বোধ হয়, ঠিক জানি না। আচ্ছা, নমস্কার।

আর না দাঁড়িয়ে বাড়ীতে ঢুকে গেল ইন্দ্রাণী। অন্ধকারে তার মুখ ভাল দেখা যাচ্ছিল না, হয়ত একটা আচমকা ধাক্কা খাবার প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছিল মুখে।

তার মুখ ভাল দেখতে না পেলেও কথাগুলো থেকে এই রকমের একটা ধারণা ডাঃ চক্রবর্তীর মনে হল।

আর কিছু বলবার সুযোগ পাওয়া গেল না, একটু সময় ইন্দ্রাণীর বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থেকে গাড়ীতে উঠলেন।

৬

শিবানীর চিঠি পেল ইন্দ্রাণী দিল্লী থেকে।

সে লিখেছে, বৌভাত হয়নি, আফিসের লোকদের খাওয়ান হয়েছে। দামী শাড়ি গয়না নিয়ে মালবিকা ও সমীরের ছোট ভাই এসেছিল। ঠাকুমার রাগ যায়নি কিন্তু দামী জড়োয়া নেকলেস ও ব্রেসলেট পাঠিয়েছেন। নূতন কোয়ার্টারে উঠে এসেছে তারা, জিনিসপত্র কিনে ঘর সাজিয়েছে।

আরও অনেক কথা লিখেছে মনের আনন্দে। চিঠির শেষে নিজের রোল নম্বর পাঠিয়েছে পরীক্ষার ফল জানাবার জন্য।

ইন্দ্রাণী আনন্দ প্রকাশ করে চিঠির উত্তর দিল, কিছু টাকা পাঠিয়ে দিল পছন্দ মত শাড়ি জামা ও দু'একটা গয়না কিনে নেবার জন্য।

নূতন কলেজে কাজ করতে আরম্ভ করেছিল ইন্দ্রাণী।

তার মাইনে কিছু বেড়েছে, কি করে তার সম্মানও কিছু বেড়েছে দেখল। একেবারে সিনিয়র প্রোফেসরের পদ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ এবং জানিয়েছেন হেড অব দি ডিপার্টমেণ্টের পদ খালি রাখা হল তার জন্য। পড়াশোনায় উৎসাহী দু'চারটি কম বয়সের অধ্যাপিকা ছিলেন ষ্টাফের মধ্যে, তার বিভাগের দু'টি অধ্যাপিকা ডাঃ চ্যাটার্জির ছাত্রী। এদের সঙ্গে সহজে ভাব হয়ে গেল।

শিবানীর বিয়ে এবং নূতন কলেজে সামান্য কিছু বেশী বেতন পাবার ফলে ইন্দ্রাণীর ওপরে চাপ কিছু কমে গেল। মাস চার অতিরিক্ত পরিশ্রম করে থিসিস শেষ করে সে ডাঃ চ্যাটার্জির হাতে দিল।

খুশী হয়ে তিনি বললেন, ডকটরেট তুমি পেয়ে যাবে। এবার নিউ স্কুল অব হিষ্ট্রির আইডিয়া পপুলারাইজ করবার জন্য কিছু কিছু লিখতে আরম্ভ করো, ছাপবার ব্যবস্থা করে দেব আমি।

তোমাকে বলা হয়নি আমার **Undercurrents of Recent Indian History** বইখানা ছাপা শেষ হয়েছে, মাসখানেকের মধ্যে বাজারে বেরিয়ে যাবে। পাবলিশাররা বলছিল এডভান্স বিজ্ঞাপন দিয়েছিল আমেরিকার দু'টো কাগজে, অনেকগুলো অর্ডার পেয়েছে।

হেসে বললেন, এত আগ্রহের দু'টো কারণ থাকতে পারে। হয়ত ধরে নিয়েছে আমি দেশের রুলিং পার্টি ও পার্টির নেতাদের খুব গালাগালি করেছি আমার বইতে। অথবা এদেশের অবস্থা ভাল করে বোঝবার কিছু আগ্রহ আছে ইণ্টেলেকচুয়াল মহলে।

সুবিমলের নতুন বুলেটিন ক্রিশ্চিয়ান্ সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ মিশনারীদের ভূমিকার কথা তুললেন ডাঃ চ্যাটার্জি।

ইন্দ্রাণী জানাল তার নামেও এক কপি এসেছে। বলল, আমার বিভাগের লেকচারারদের পড়তে দিয়েছি পেপারটা।

ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, ব্রিটিশরা চলে যাবার পর থেকে ইংরাজ মিশনারীদল উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে বাস করে যে কাজ করছিলেন তার দিকে অনেকবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কর্তৃপক্ষ কোন কথা কানে তোলেননি। ক্রিশ্চান নাগা ও মিজোরা ধর্ম ও কালচারের ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে প্রমাণ করেছে মিশনারীদের ক্রিশ্চান কম্যুনালিজম প্রচার সফল হয়েছে। অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করেছে সুবিমল তার আলোচনায়, সেণ্ট্রাল ও আসাম সরকারের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা করেছে। কয়েকজন জাপানী য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপকদের বক্তব্য এবং দু'জন আমেরিকান অধ্যাপকের বক্তব্য তুলে দিয়েছে বুলেটিনের শেষে।

ইন্দ্রাণী বলল, সুবিমলদার বুলেটিন সত্যি ভাল হয়েছে। পাকিস্তান ও চীন এই আন্দোলনে যে সাহায্য করছে নানাভাবে ভারতকে বিব্রত করবার জন্য, তার অনেক সাক্ষ্য প্রমাণও দিয়েছেন। ভাবছি এই বুলেটিনের রিভিয়্যু লিখে কয়েকটা কাগজে পাঠাব।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পরে ইন্দ্রাণী ডাঃ চ্যাটার্জির কাছে বিদায় নিয়ে মাসীমার ঘরে গিয়ে বসল।

মাসীমার অনুরোধে তিন চার দিন তাঁর কাছে কাটাল ইন্দ্রাণী। তারপর ছোট বোন শর্বাণীকে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে পড়া শোনা দেখিয়ে দেবে বলে তাকে বাড়ীতে নিয়ে এল। শিবানী ভাল-ভাবে বি. এ. পাশ করেছিল সে খবর তাকে জানিয়ে দিয়েছিল।

পূজোর ছুটি এসে পড়ল সপ্তাহ দুই পরে। ডাঃ চ্যাটার্জি সপরিবারে বাইরে গেলেন ছুটিতে। পিতার অসুখের কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছিল বলে তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্য মাসীমার নিমন্ত্রণ নিতে পারল না ইন্দ্রাণী।

পল্লীর কোন পাব্লিক ব্যাপারে ইন্দ্রাণী বিশেষ মিশত না কোন দিন, নিজের কাজকর্ম নিয়ে চুপচাপ কাটিয়ে দিত। এবার পূজোর সময় দেখল পল্লীতে তার খাতির বেড়েছে। ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে এসে তাকে পূজো প্যাণ্ডেলে, থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। পল্লীর গণ্যমান্য লোকেরা, বিশেষ করে তাঁদের নেতৃস্থানীয় দু'জন, সুকোমল ভৌমিক ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এগিয়ে এসে তার সঙ্গে আলাপ করছেন। বিজয়া সম্মেলনের দিন ছেলেমেয়েরা এসে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল বক্তৃতা করবার জন্য।

শর্বাণী বরাবর আড্ডাবাজ মেয়ে। পূজোর ক'দিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিল। রাত্রে শোবার সময় ছাড়া ইন্দ্রাণী তাকে দেখতে পেত না।

পূজোর অবকাশ শেষ হল।

ডাঃ চ্যাটার্জি ফিরেছেন খবর পেয়ে ইন্দ্রাণী দেখা করতে গেল। নূতন খবর দিলেন তিনি। আমেরিকার তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক'টা বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন, মাস তিনেক লাগবে হয়ত। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে উত্তর দেবেন মনে করেছেন।

খবর শুনে ইন্দ্রাণী আনন্দ প্রকাশ করল।

ডাঃ চ্যাটার্জি হেসে বললেন, আনন্দ প্রকাশ তো করছ কিন্তু যাওয়া সম্ভব হবে কি না নির্ভর করছে তোমার ওপরে।

আমার ওপরে ? কেমন করে মেসোমশাই ?

তোমার মাসীমাও যাচ্ছেন, আমাকে একা ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক। অপুদের সামলাবার ভার যদি তুমি নাও তাহলে যাওয়া হতে পারে।

এ আর শক্ত কাজ কি মেসোমশাই ? অপুরা আমার বাধ্য, ওদের সামলাতে পারব ঠিক। চলে যান আপনারা।

ব্যবস্থা করতে দিন পনের লাগবে। এখনই তোমার মাসীমার কাছে কথা ফাঁস করো না।

ইন্দ্রাণীকে বললেন বটে এই কথা, কিন্তু সেই দিনই নিজে স্ত্রীর কাছে কথাটি ফাঁস কবলেন।

তিন সপ্তাহ লেগে গেল যাবার সব ব্যবস্থা শেষ করতে। ইন্দ্রাণীকে বাড়ীতে রেখে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে রওনা হয়ে গেলেন।

রওনা হবার দু'দিন আগে ডাঃ চ্যাটার্জি ইন্দ্রাণীকে জানালেন তার থিসিস এপ্রুভড্ হয়েছে। এক সপ্তাহ পরে খবরের কাগজে এ সংবাদ বেরল। ইন্দ্রাণী নিজে য়ুনিভার্সিটির চিঠি পেল।

কলেজের ছাত্রীরা ও টিচিং স্টাফ মিলে প্রোফেসার ডাঃ ইন্দ্রাণী সান্যাল এম এ. ডি. ফিল কে সভা করে সম্বর্ধনা জানাল। মানপত্র, দামী কলম ও দু'টো রূপোর ফুলদানি উপহার দিল।

ক'দিন পরে সুকোমল ভৌমিক ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে দেখা করে নৃসিংহগড়ে সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত হবার জন্য নিমন্ত্রণ করল।

বলল, আপনি আসলে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলাপ হবে। হয়ত গুজব শুনেছেন পল্লীর মেয়েদের স্কুলটাকে বাড়িয়ে মেয়েদের জন্য একটি কলেজ করবার ইচ্ছা আছে আমার। আমাদের অভিপ্রায় আপনাকে এই নূতন কলেজে নিয়ে আসব প্রিন্সিপালের পদে।

ইন্দ্রাণী যেতে স্বীকার করল।

সুকোমল ভৌমিক বলল, গাড়ী পাঠাব, ডাঃ চ্যাটার্জির ছেলে মেয়েদের নিয়ে যাবেন।

সুকোমল ভৌমিক চলে গেলে তার কথা, তার কলেজ করবার প্রস্তাবের কথা কিছুক্ষণ ভাবল ইন্দ্রাণী।

অনেক রকমের কাজ কারবার ক'রে, ব্ল্যাকমার্কেটিং ক'রে প্রচুর পয়সা করেছে সুকোমল ভৌমিক। তার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে নানা রকমের কথা শোনা যায় লোকের মুখে। ভাল নয় চরিত্র। এদিকে টাকা খরচ করে ভাল কাজে। স্কুল করেছে, লাইব্রেরী করেছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা অনেক ভাল করেছে পকেট থেকে টাকা দিয়ে। নৃসিংহদেবের মন্দির ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মন্দির শেষ হচ্ছিল না টাকার অভাবে। মন্দির ও দেবোত্তর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হাত থেকে বের করে ট্রাষ্টী বোর্ডের হাতে আনবার চেষ্টা করছে। এজন্য বাইরে যত ভালভাব দেখাক ভেতরে ভেতরে সে জাতক্রোধ সুকোমল ভৌমিকের ওপরে। তার বিরুদ্ধে দল খাড়া করবার চেষ্টা করছে সে, সুবিধা করতে পারেনি। সুকোমল বুদ্ধিমান, টাকাওয়ালা লোক, পপুলার, তার দল প্রবল। লেখাপড়া বিশেষ করেনি কিন্তু কোথাও মিশতে আটকায় না, বড় বড় পাণ্ডা লোকদের সঙ্গে তার আলাপ। শোনা যাচ্ছে বিধান সভায় এবার দাঁড়াবে।

সে ভাবে টাকাওয়ালা লোকদের টাকার পাহাড় কি উপায় গড়া হয়েছে কে খবর নিচ্ছে? ব্ল্যাকমনিওয়ালারা এখন সব ব্যাপারে কর্তা।

সুকোমল ভৌমিকের কিছু টাকা পাঁচজনের উপকারে, সুবিধার জন্য খরচ হচ্ছে এইটে বড় কথা।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবস্থাও বেশ ভাল। নৃসিংহগড়ের আদি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন, দেবতার সেবাইত, বাধ্য ও অনুগত লোকের অভাব ছিল না। মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য নানা রকমের স্কীম নিয়ে লোকের কাছে ঘুরে বেড়িয়ে সে টাকা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে। মহাজনী কারবারও কিছু আছে।

কিন্তু শোনা যায় অনেক বয়স হয়ে গেলেও লোকটি অসচ্চরিত্র,

ফিচেল বুদ্ধির, অসাধু। সুকোমল ভৌমিক তার পেছনে যাতে না লাগে এজন্য তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আড়ালে তার সম্বন্ধে অপ-প্রচার করে।

সম্বর্ধনা সভা যথা সময়ে হল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইন্দ্রাণীর প্রশংসা করে নিজের পায়ের ধূলি হাতে করে নিয়ে ইন্দ্রাণীর মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করল। সুকোমল ভৌমিক পল্লীর জনসাধারণের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করল ডাঃ সান্যালকে প্রস্তাবিত কলেজের প্রিন্সিপালরূপে পাওয়া যাবে। এ কথাও জানিয়ে দিল প্রস্তাবিত কলেজের গভর্ণিং বডিতে ডাঃ এন. পি. চ্যাটার্জি এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তীকে পাওয়া যাবে ডাঃ সান্যাল একটু চেষ্টা করলে।

সুকোমল ভৌমিক ভদ্রতা করে ইন্দ্রাণী ও অপুদের নিজের গাড়িতে তুলে দিল ফেরবার সময়ে। কয়েকটা খাবারের বাক্স এবং ফুলের মালাও তুলে দিল।

ফেরবার সময়ে ইন্দ্রাণী লক্ষ্য করল ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ীতে লোক দেখা যাচ্ছে।

তার প্রশ্নের উত্তরে ড্রাইভার জানাল ডাঃ চক্রবর্তীর এক দাদা সপরিবারে এসেছেন বাড়ীতে। ডাঃ চক্রবর্তী বোধহয় মাস খানেকের মধ্যে ফিরবেন।

সপ্তাহে সপ্তাহে আমেরিকা থেকে চিঠি আসছিল।

চিঠি বেশীর ভাগ মাসীমার লেখা, মেসোমশায় ভয়ানক ব্যস্ত। মাসীমার চিঠিতে তিন ছেলেমেয়ের কথা বেশী, তারই মধ্যে টুকরো টাকরা ওদেশের খবর। ওদেশের থাকা খাওয়া, চলা ফেরার কথা কিছু, নূতন আলাপী স্ত্রী পুরুষদের কিছু খবর।

সুশোভনের একটা পেপার এল ডাঃ চ্যাটার্জির নামে। পোলাণ্ডের ডাকের ছাপ। খুলে পড়তে লাগল ইন্দ্রাণী।

আমেরিকার কোথায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করছিলেন সুশোভন দা। মেসোমশায়ের কাছে শুনেছে এ চাকুরি ছেড়ে দিতে

হয়েছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাবের তীক্ষ্ণ সমালোচনার জন্য। খানিকটা পরোক্ষ সরকারী চাপ ছিল তার মধ্যে। কাগজে লিখে ও বক্তৃতা দিয়ে কিছুদিন চালালেন। তারপর য়ুরোপে গিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে একটা পোলিশ বিদ্যালয়ে চাকুরি পেয়ে গেলেন।

চাকুরি করেন, নানা দেশের কাগজে প্রবন্ধ লেখেন। জার্মান ও রাশিয়ান ভাষা জানেন, চীনা ভাষাও কিছু জানেন।

ভারতবর্ষের সম্পর্কে রাশিয়া, আমেরিকা ও চীনের নীতি ও কার্য-কলাপ সুশোভন দার বিশেষ অধ্যয়নের বিষয়। তাঁর প্রত্যেকটি বুলেটিনে এই সমস্যার একটা দিক নিয়ে আলোচনা থাকে। তাঁর লেখায় তথ্য সমাবেশ, ওরিজিনালিটি ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

হাতের প্রবন্ধটির পাতা ওল্টাতে লাগল, কখন এক সময়ে মন নিবিষ্ট হয়ে গেল। শেষের দিকে লিখেছেন, চীন ও রাশিয়াকে ঠেকাবার জন্য আজ ক'বছর ধরে আমেরিকানরা আগুন ও গ্যাস ছড়াচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েটনামে। ভারতবর্ষকে ভেঙ্গে দু'ভাগ করেছিল এংলো-আমেরিকানরা রাশিয়াকে ঠেকাবার জন্য, ভারতকে দাবিয়ে রাখবার জন্য। অজস্র অর্থ ব্যয় করে পাকিস্তানে listening posts তৈরী করেছে, ভারত ভাগ হবার আগেই ষ্ট্র্যাটেজিক গিলগিট অঞ্চল দখল করে বিরাট এয়ার বেস তৈরী করেছিল তারা। শক্তিশালী চীনের আবির্ভাবে পুরনো ক্যালকুলেসনস অকেজো হয়ে যাচ্ছে। এশিয়ায় আমেরিকান একসপ্যান্‌শনিজ্‌মে বাধা দেবার দিন রাশিয়ার চলে গিয়েছে, আমেরিকাকে বোঝাপড়া করতে হবে চীনের সঙ্গে, যদি মাও সে'টুঙের মৃত্যুর পরে চীনে খেয়োখেয়ি না লেগে যায়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এংলো-আমেরিকানদের সৃষ্ট, তাদের দ্বারা পুষ্ট, তাদের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান চীনের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভারতের অন্তর্গত কাশ্মীরের দু'হাজার বর্গ মাইল গুরুত্বপূর্ণ ষ্ট্রাটেজিক বেদখলি অঞ্চল চীনকে দিয়ে

দিয়েছে। চীনের সামরিক শক্তি অটুট থাকলে, বর্তমান লীডার দলের হাতে ক্ষমতা থাকলে এ সম্ভাবনা আছে যে অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের listening posts ও গিলগিটের এয়ার বেস ছেড়ে পালাতে হবে আমেরিকানদের। এ কার্য করা সত্ত্বেও পাকিস্তান সম্পর্কে আমেরিকানদের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি; এতে প্রমাণ হয় তাদের প্রচারিত "Contain China" নীতি সঙ্গতিশূন্য ও অভিসন্ধিমূলক।

প্রবন্ধটা রেখে দিয়ে সুশোভনের কথা ভাবছিল ইন্দ্রাণী। সুশোভন, সুবিমল, অনিমেষ, দীপঙ্কর এই চারজনকে নিয়ে নিউ স্কুল অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রির কাজ চলেছে। সে হচ্ছে ফালতু সভ্য এই দলের। ডাঃ নিরঞ্জনপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মন্ত্র-দীক্ষিত, উৎসাহী ছাত্র এরা, ধূলি, ধোঁয়া, জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সত্যের দীপ জ্বালিয়ে দেয়া এদের কাজ।

নিজের সম্বন্ধে একটা চিন্তার ভাব এসেছিল ইন্দ্রাণীর মাথায়।

নিজের জীবনের দৈনন্দিন সংগ্রাম, নানা রকমের তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তাকে যে ডাঃ চ্যাটার্জির কাছে যে মন্ত্র গ্রহণ করেছে তার অনুশীলন করে কোন নূতন কাজ আরম্ভ করতে পারেনি। মনকে আশ্বাস দিয়েছে শীঘ্রই কাজ করতে আরম্ভ করবে।

কাজ আরম্ভ করবার পক্ষে একটা নিরুৎসাহজনক ব্যাপার এই সে দেখেছে যে লেখাপড়া যারা করে, লেখাপড়া করা যাদের পেশা সাধারণভাবে তাদের মনের সংকীর্ণতা ও ঔদাসীন্য দূর করা ভারি শক্ত। পর দেশের সঙ্গে কোন রাষ্ট্রের সম্পর্কের নীতি স্থির করবার ব্যাপারে ইডিওলজির কোন স্থান নাই, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং রাষ্ট্রের বা জাতির স্বার্থ (নিরাপত্তা ও সুবিধা) সম্পর্কের নীতি নির্ধারণে প্রবল হওয়া উচিত, ইতিহাসের এই সাধারণ কথাটা বুঝতে প্রচুর অসুবিধা দেখা যায়।

ব্রিটিশ ট্র্যাডিশনস ও প্রোপাগাণ্ডা ভারতের ইতিহাস লেখকদের এ

পর্যন্ত ভুল পথে চালিয়েছে, নিজের চোখে দেখবার ও নিজের বুদ্ধিতে বিচার করবার শিক্ষা তাঁদের হওয়া দরকার এই কথাই নিউ স্কুল অব হিষ্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ চ্যাটার্জি জোর দিয়ে বলেন।

গোড়ার এই কথাটি সে লেখায় ও বক্তৃতায় বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে কিন্তু দেখেছে উৎসাহী সমর্থক পাওয়া খুব শক্ত। নিজের ছাত্রীদেরও এই কথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরীক্ষায় পাশের ওপারে তাদের দৃষ্টি সহজে যায় না।

যে উৎসাহ নিয়ে ডাঃ চ্যাটার্জি নিজে, সুশোভন দা, সুবিমল দা, অনিমেষ ও দীপঙ্কর কাজ করে যাচ্ছে সে উৎসাহ সে সংগ্রহ করতে পারছে না কেন? এখন তো কিছু ভাল অবস্থায় পৌঁছেছে, তবু কেন পারছে না?

গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবে ইন্দ্রাণী।

এক সপ্তাহ পরে।

অপুরা বিকেলে মামার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছে, রাতে খেয়ে ফিরবে। ইন্দ্রাণী বাবাকে দেখে আসবার জন্য নৃসিংহগড়ে গেল।

ফিরে এল যখন তখনও অপুরা ফেরেনি। দেখল টেবিলের ওপরে বিলাতী ডাকের ছাপ মারা একটি প্যাকেট রয়েছে। উল্টে পাল্টে দেখল ডাঃ ইন্দ্রাণী সান্যালের নামে রোম থেকে আসছে, প্রেরক এস. চক্রবর্তী।

প্যাকেট খুলতে বেরোল একটি মেয়ের ছবি, চুলে ফুল পরে হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবিটা ইন্দ্রাণী সান্যাল নামে মেয়েটির।

পরের চোখে তাকে কেমন দেখায় এই সে প্রথম দেখল।

মুখের হাসির সঙ্গে একটু ধরা-যায়-কি-যায়-না লাজুক ভাব রয়েছে, না?

এই রকম চেহারা করে সে দিন সে দাঁড়িয়ে ছিল নাকি ভদ্রলোকের সামনে? না নিজেই এই হাসিটা বসিয়ে দিয়েছেন ছবি যিনি এঁকেছেন?

কিন্তু চুলে ফুল তো সে নিজেই পরেছিল সে দিন। তাঁর বাগানের গাছ থেকে বিনানুমতিতে ফুল নিয়ে পরেছিল দেখে এক গোছা ফুল এনে সামনে ধরেছিলেন। প্রত্যাখ্যান না করে সেই ফুল নিয়ে চুলে পরেছিল সে। কেন পরেছিল ?

বাইরে গেলেও তার সব খবর রাখেন দেখা যাচ্ছে। সে ডকটরেট পেয়েছে, ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ীতে রয়েছে এখন, কি সূত্রে জানলেন ? মেসোমশাই জানিয়েছেন ? কি দরকার হয়েছিল জানাবার ? জানতে চেয়েছিলেন ? তাই বা কেন চাইলেন ?

ছবি সামনে রেখে ভাবছিল ইন্দ্রাণী। এলোমেলো ভাবনা আসছিল যাচ্ছিল ইচ্ছামত।

যৌবনের শেষ ডালে হঠাৎ একটা লাজুক কুঁড়ি ধরেছিল, ফোটবার আগে ঝরে পড়ে গিয়েছে সংসারের প্রখর তাপে। কুঁড়ির আবির্ভাব যে ঘটেছিল ভাল করে খেয়ালেই আনেনি সে। খেয়াল করলে কি তাকে আদর করত ইন্দ্রাণী ? না, করত না।

যৌবন একটা বাজে ইচ্ছা মনে জাগাবার ঋতু, বাজে কথা ভাববার ঋতু। বাজে ইচ্ছা করবার, বাজে কথা ভাববার অবসর কোথায় তার ?

একটা অবাস্তব স্বপ্ন রঙ ছিটিয়ে উঁকি দিয়েছিল মনে অসতর্ক মুহূর্তে। কি তার দাম বাস্তব জীবনে ?

রজনীগন্ধা ফুল তো কতই ফুটছে রোজ, আর কোনদিন তো চুলে পরবার ইচ্ছা হয়নি। মনকে শাসন করে দিয়েছে সে, এ সব ইচ্ছা করতে নাই, বাজে ইচ্ছা এ সব।

মনে আছে চুলে ফুল পরে প্রণাম করেছিল। তাঁর জ্ঞান, গুণ, সাধনাকে প্রণাম করেছিল। এ সব জিনিস প্রণম্য, চিরকাল প্রণামের যোগ্য। মাথা নামিয়ে, হাত জোড় করে সম্মান জানাতে হয় এ সব জিনিসকে, ঠিকই করেছিল সে।

তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে ?

চুলে গোটা কয়েক ফুল পরেছিল। কেজুয়েল ব্যাপার ওটা।

একটা কেজুয়েল ব্যাপারের মধ্যে একখানা খাতা বোঝাই পত্র ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করা হাস্যকর উদ্যম।

সে যা করেছে তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তৈরী আছে। কিন্তু ছবিটা আঁকবার, তাকে পাঠাবার ব্যাখ্যা কি হতে পারে? কয়েকটা মিনিটের একটা অর্ধ-নাটকীয় ব্যাপার মনে পুষে রেখে ছবিতে সেটা ধরে রাখবার মানে কি? তাকে পাঠানো হলই বা কেন? এ ছবির কোন দাম থাকলে মন থেকে এমন নিখুঁতভাবে কাগজে যিনি ছবি তুলতে পারেন তাঁর কাছে থাকবার কথা। তার নিজের ছবির কি মূল্য আছে তার কাছে? স্মৃতিচিহ্ন? কিসের স্মৃতি?

একটা মূল্য আছে হয়ত। তার একদিনের ছেলেমানুষির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে ছবিটা পাঠিয়ে।

দেবার মধ্যে আর কোন অভিপ্রায় থাকা কি সম্ভব? কোন অভিপ্রায় নাই, চিত্রকরের স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন তাকে পাঠিয়ে। সহৃদয়তা, ভদ্রতা, কোমলতা তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।

এত কথা ভাববার পরে ছবিখানা হাতে নিয়ে আবার দেখতে লাগল ইন্দ্রাণী।

সাতাশ আটাশ বছর বয়েস, এম. এ., ডি. ফিল. ডিগ্রিধারী, হিষ্ট্রির সিনিয়র লেকচারার ডাঃ শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সান্যাল, চুলে রজনী-গন্ধা ফুল গোঁজা, এই হাসি-হাসি-মুখ মেয়েটি কি সত্যি তুমি? বিশ্বাস হয় না।

ভাবে বিশ্বাস না হলে কি করা যাবে? কত অবিশ্বাস্য কাণ্ড সংসারে ঘটে থাকে শোনা যায়। এটাও সেই রকমের একটা কাণ্ড।

কি করবে এই ছবি নিয়ে ভাবতে লাগল। কোথায় রাখবে এটা? দেয়ালে না বাক্সে?

বাক্সে রাখতে যাচ্ছে দুপদাপ করে ঘরে ঢুকল মামার বাড়ী ফেরৎ অপু ও তার দু'ভাই।

তোমার হাতে ওটা কি ইণী দি? ছবি? কার ছবি দেখি—

খপ করে হাত থেকে কেড়ে নিল।

দু'মিনিট ধরে দেখল ছবি, দু ভায়ের চিৎকার থামাবার জন্য তাদের দেখাতে হল, তারপর বলল, ফটো থেকে আঁকা হয়েছে। ফটোটা দাও তো, মিলিয়ে দেখি। কে আঁকল ছবিটা ইণী দি? কত টাকা নিয়েছে বলো না।

তারপর বলল, অনেক দিন আগে ফটো তুলিয়েছিলে, না? কত আগে? আচ্ছা, ফটোটা বের করো।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল ইন্দ্রাণী, একটু শুকনো মুখ করে বলল, ফটো তো নেই ভাই।

নেই? তার মানে ফেরৎ দেয়নি ছবিওয়ালা? মেরে দিয়েছে? ব্যাড, ভেরি ব্যাড। একটি ভদ্রলোকের মেয়ের ফটো লোকটা রাখবে কেন? কড়া করে লিখে দাও ফটো পাঠিয়ে দিক।

কাছে এসে কোমর জড়িয়ে ধরল, কাদের দেখাবার জন্য এমন সেজে ফটো তুলেছিলে ইণী দি? কেন বিয়ে হল না? অনেক টাকা চেয়েছিল বুঝি বোকারাম ছেলের বাপ? বোকারাম নয়তো কি? জানত না টাকা তার বাপ মেরে দিত, কিছু দিত না তাকে? অফুলি বোকা।

কি সব বাজে বকছিস অপু? দে ছবিটা। চল পড়াশোনা কেমন হচ্ছে দেখব।

এক পায়ের ওপরে ঘুরতে লাগল অপু, পড়াশোনা নেহি করেঙ্গে, কাল ছুটি হ্যায়, ছুটি হ্যায়।

নাচ থামিয়ে একটা হাত ধরল ইন্দ্রাণীর, একটা নূতন ছবি এসেছে পাড়ায়, দেখাবে ইণী দি? দারুণ ইন্টারেষ্টিং ছবি শুনলাম।

সে কাল হবে, চল এখন পড়বার ঘরে।

৭

মেসোমশায় ও মাসীমার চিঠি এল।

আর একমাস পরে ওঁরা ফিরছেন। য়ুরোপে যাবার ইচ্ছা ছিল, যাওয়া হবে না। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে বাইরে বেড়াতে আর ভাল লাগছে না মাসীমার।

মেসোমশাই ইন্দ্রাণীকে আলাদা করে লিখেছেন, এখানে কি দেখলাম, শুনলাম, বুঝলাম তার একটা বিবরণ তোমাকে পাঠাব ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমার মাসীমা খানিকটা জায়গা নিলেন, তাই সংক্ষেপে কি বুঝলাম তোমাকে জানাচ্ছি। যদি ফ্যাক্টস চাও পরে দেব।

আমেরিকায় ডেমোক্রেসী নাই, আছে বিগবিজনেসের ডিক্টেটর-শিপ। রাশিয়ায় আছে, পোলিটিশিয়ানদের ডিক্টেটরশিপ, চীনে পোলিটিকো-মিলিটারি দলের ডিক্টেটরশিপ।

আমেরিকায় বরাবর ডিক্টেটরশিপ চলে আসছে, নইলে ছত্রিশ রকমের জাত মিলে এক জাত হতে পারত না, ছত্রিশ রকমের ভাষা লোপ করে, এক ভাষা চালু হত না। আর অতগুলো অর্ধ-স্বাধীন ষ্টেট নিয়ে শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হত না।

যদি আমেরিকায় বাস করতে চাও তোমাকে টু হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট আমেরিকান হতে হবে, এই হল তাদের কথা।

তুমি ভারতবর্ষে বাস করে পাকিস্তানী, ব্রিটিশার, আমেরিকান, চীনা হতে পারো এমন কথা আমাদের দেশেই শোনা যায়।

রাজনীতিতে আমেরিকানরা বরাবর একসপ্যান্‌শনিষ্ট। পরের দেশ দখল করে, মেরে কেটে প্রকৃত দেশের মালিকদের যারা শেষ করে এনেছে তারা হাড়ে হাড়ে একসপ্যান্‌শনিষ্ট হবেই তো।

আমেরিকায় রাজনীতিক ও বিগবিজনেস এবং ইণ্টেলেকচুয়াল দলের মধ্যে অনেকটা ফারাক।

দেশের সাধারণ লোক যেমন কুসংস্কারাছন্ন তেমনি crude.

রাশিয়ার প্রতি বিরুদ্ধ-ভাব এদের মধ্যে একটা ক্রীড। ক্রীডের মূলে ক্যাপিটেলিজম কম্যুনিজম নাই, আছে প্রতিদ্বন্দ্বী একস-প্যান্শনিজম্। নূতন চীনের বিরুদ্ধতার মূলেও রয়েছে তাই।

চীনকে ঠেকাবার জন্য ভারতবর্ষকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হতে সাহায্য করবার ইচ্ছা এদের কল্পনায় নাই। ভারতের চীন-ভীতিকে over dramatisation of the threat বা ভীতির ভান মনে করে।

আমেরিকার ইণ্ডিয়া পলিশির মধ্যে সঙ্গতি বা প্রিন্সিপল্ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরা চায় India should always be like the pie in which they can put not one but all their fingers. ভারতবর্ষের অবস্থা এমন থাকবে যাতে তার সব ব্যাপারে তারা ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারে।

সায়ান্স ও টেক্নোলজিতে অসাধারণ উন্নতি করেছে। যতটা সম্পদ তাদের পক্ষে ভাল তার চাইতে অনেক বেশী সম্পদ সঞ্চয় করেছে, মাথা গরম হওয়া স্বাভাবিক। একটা ভাল লক্ষণ এই যে ইণ্টেলেকচুয়াল জিজ্ঞাসাপ্রবৃত্তি এখনও শ্বাসরোধ হবার অবস্থায় আসেনি।

এই চিঠি পাবার ক'দিন পরে কলেজে যাবার জন্য নীচে নেমে এল ইন্দ্রাণী ব্যাগ হাতে নিয়ে, একখানা গাড়ী বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নেমে লম্বা পা ফেলে একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, নমস্কার করলেন।

হঠাৎ ভদ্রলোকটিকে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখে কি বলবে ইন্দ্রাণী, কি করবে, ভেবে না পেয়ে একটা প্রণাম করল।

তারপর দেখল বেশ সহজভাবে বলতে পারল, কবে ফিরলেন? ভাল আছেন? আসুন, বসবেন।

কাল ফিরেছি। কলেজে বেরোচ্ছ? এখন বসব না, দেরি হবে তোমার। চলো, কলেজে পৌঁছে দিই, দু'একটা কথাও হবে।

বিনা বাক্যে ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল ইন্দ্রাণী। ড্রাইভারের সীটে বসে দোর খুলে ধরলেন, পাশে বসে পড়ল।

নূতন কলেজের ঠিকানা বলে দিল জিজ্ঞাসা না করতে, তারপর বলল, আপনার পাঠানো ছবিটা পেয়েছি।

একটু হেসে বললেন, তোমার ভাল লাগতে পারে মনে করে পাঠিয়েছি। ভাল লাগল কি?

মাথা নেড়ে ইন্দ্রাণী জানাল ভাল লেগেছে।

কথা বলতে সাহস পেল না নাকি? সহৃদয়তা, ভদ্রতা, কোমলতা যার স্বভাবে রয়েছে বলে ছবিটা তাকে পাঠিয়েছেন ভেবে নিয়েছিল তাঁকে একটা মৌখিক ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে চুপ করে থাকবার কি মানে করা যায়? এই যে ভদ্রলোকটি ছ'মাস বিদেশে কাটিয়ে কাল ফেরবার পরে আজ সকালে দেখা করতে এসে তাকে আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে দিলেন একটু দ্বিধা না করে, কোন ভূমিকা না করে, এটা তার গায়ে বাধল, মানে বাধল, এমন একটা ভাবও তো প্রকাশ করতে পারত ইন্দ্রাণী। কেন তা করল না? কেন করবার চেষ্টায় একটু নড়ে চড়ে বসবার উদ্যমটুকুও দেখা গেল না যেন কবে থেকে তাকে তুমি বলে আসছেন, আর সেইটে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে?

এ সবের ধারে কাছে দিয়ে গেল না সে, বলল, চেহারা তেমন ভাল দেখাচ্ছে না, অসুখ করেছিল?

ভালই ছিলাম, ক'দিন আগে ঠাণ্ডা লেগে সর্দিজ্বর মত হয়েছিল।

আপনার বাড়ীতে কারা এসেছেন শুনলাম।

আমার মেজদা সপরিবারে ছিলেন ক'দিন। পরিবারের আর সবাই চলে গিয়েছেন ভবানীপুরের বাড়ীতে, মেজদা একা আছেন এখন। ভাল চাকুরি করতেন ডিফেন্স মিনিষ্ট্রিতে, আলাপ করবার মত মানুষ।

তারপর বললেন, একটা অনুরোধ, পরশু রবিবার সকালে ডাঃ চ্যাটার্জির ছেলেমেয়েদের নিয়ে যদি আসা সম্ভব হয় আমার বাড়ীতে, ওখানে যাবে সবাই—

রাজি হতে ইন্দ্রাণীর সময় লাগছিল দেখে বলতে যাচ্ছিলেন অসুবিধা থাকলে—

ইন্দ্রাণী বলল, আচ্ছা।

এতক্ষণ পরে ভদ্রলোকটি বললেন, তুমি ভাল ছিলে ?

ভালই ছিলাম।

কিছু ভাবছ ?

মুখ তুলে ইন্দ্রাণী তাকাল তাঁর দিকে, হ্যাঁ, ভাবছি।

হাসলেন একটু, আচ্ছা ভাবো।

কলেজের সামনে নেমে গেল ইন্দ্রাণী। বললেন, পরশু সকালে সাড়ে আটটা নাগাদ গাড়ী যাবে আনতে।

আচ্ছা।

কলেজে কিছু ভাববার অবসর পেল না, পর পর চারটে ক্লাস। একটু বিশ্রাম করে বাড়ী ফেরবার ধকল।

অপুদের কিছু বলল না নিমন্ত্রণের কথা। তাদের নিয়ে পড়াশোনা দেখাতে বসল।

এক ঘরে শুত সবাই। তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ভাববার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ কি ঘটছে। কিছুটা ভাবতে না ভাবতে টের পেল ঘুমে ছ'চোখ জড়িয়ে আসছে। কাল ভাবলে চলবে মনে করে শুয়ে পড়ল একটু বাদে।

ভাবনার কিছু চোখে না পড়লে ভাবছি বলে ঘুম জড়ানো চোখকে ঠেকিয়ে রাখা কঠিন।

রবিবার সকালে নিমন্ত্রণের কথা শোনবার পর থেকে এমন হৈ হুল্লোড় লাগাল তিন ভাই বোন যে ইন্দ্রাণী ভাবতে লাগল কি করে এদের সামলে রাখবে ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ীতে। এই ভাবনা বড় হয়ে উঠল আর সব ভাবনাকে ছাপিয়ে।

আর সব ভাবনা মানে ছোট, বড়, মাঝারি সাইজের নানা রকমের বহুসংখ্যক ভাবনা, গুছিয়ে বেঁধেছেঁদে নিতে গেলে অনেকগুলো প্যাকেট হয়ে যাবে। বসে বসে অতগুলো প্যাকেট বাঁধবার সময় কোথায় ?

সময় যতটুকু করে নেয়া যেত অপুর উৎপাতে তা করে নেয়া অসম্ভব মনে হল। ভারি ষ্টাইলিশ মেয়ে অপু। শাড়ি পরতে লজ্জা করে বলে নিজে স্কার্ট পরেছে কিন্তু ইণী দির শাড়ি জামা নিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়েছে। ফুল আনবার জন্য চাকরকে বাজারে পাঠাচ্ছিল, ইন্দ্রাণী বাধা দেয়াতে তার সঙ্গে আড়ি দিয়েছে।

কিছু ঠাণ্ডা হয়ে এলেও গোলমাল তখনও চলছে গাড়ীর হর্ণ কানে এল।

ইণী দির গালে মুখে স্নো লাগাচ্ছিল অপু, হাতের তোয়ালে খানা ড্রেসিং টেবিলে রেখে দোতলার বারান্দায় ছুটে গেল। তখুনি ফিরে এসে বলল, একজন ভদ্রলোককে দেখলাম নামলেন গাড়ী থেকে, চিনতে পারলাম না ইণী দি।

ইন্দ্রাণী বুঝল কে এসেছেন। বলল, উনি ডাঃ চক্রবর্তী, মেসোমশায়ের বন্ধু। ওঁর বাড়ীতে যাচ্ছি আমরা। যা নীচে বসবার ঘরে বসাগে, আমি যাচ্ছি।

দু'ভাইকে নিয়ে অপু নীচে নেমে গেল।

এক কাপ কফি হাতে নিয়ে মিনিট পাঁচ পরে বসবার ঘরে ঢুকে ইন্দ্রাণী দেখল মজলিশ বসে গিয়েছে সেখানে। অপুর দু'ভাই দু'পাশে বসেছে, অপু পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলেছে অনর্গল।

কফি দেখে বলল, ইণী দি, বিস্কুট আনছি আমি।

ছুটছিল, হাত ধরে তাকে কাছে টানলেন ডাঃ চক্রবর্তী, বিস্কুট লাগবে না অপু। তোমরা খেয়ে নিয়েছ তো ?

দুই ভাই এক সঙ্গে জবাব দিল, হ্যাঁ, আমরা খেয়েছি।

কফির পেয়ালা হাতে নিলেন ডাঃ চক্রবর্তী।

মিনিট পনের পরে সবাই গাড়ীতে উঠল।

মেজদা, আমার বন্ধু ডাঃ ইন্দ্রাণী সান্যাল, কলেজে ইতিহাস পড়ান, ডাঃ চ্যাটার্জির প্রিয় ছাত্রী, আর এরা ডাঃ চ্যাটার্জির ছেলে মেয়ে।

নমস্কার করল ইন্দ্রাণী।

ডাঃ চক্রবর্তীর মেজদা দেবীপ্রসন্ন বাবু বললেন, আপনাকে দেখে খুশী হলাম, আশা করছি আলাপ করে আরও খুশী হব। আগে থেকে সবিনয়ে জানিয়ে রাখছি আমার কথা বলবার অভ্যাস একটু বেশী, ভায়ার মত পরিমিতবাক্ নই। এই এলেন, একটু বিশ্রাম করুন।

ছেলেমেয়েরা বাগানে চলে গিয়েছিল ডাঃ চক্রবর্তীর হাত ধরে।

একটু পরে ডাঃ চক্রবর্তীর দিদির সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে প্রণাম করল ইন্দ্রাণী।

এসো মা এসো, আশীর্বাদ করলেন তিনি। বললেন, ঠাকুর চাকররা কি করছে দেখে আসি, তুমি বসো।

বাড়ীর ব্যবস্থা দেখে একটু হাসি পেল ইন্দ্রাণীর।

বাড়ীর কর্তা যাঁর নিমন্ত্রণে এসেছে সে, ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করছেন। তাঁর মেজদা সিগার হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন, তাকে বললেন একটু বিশ্রাম করতে। তাঁদের বিধবা দিদি ঠাকুর-চাকরদের নিয়ে রান্নার তদ্বির করতে গেলেন, তাকে বললেন বসতে।

কোথায় বসবে সে, কি করে বিশ্রাম করবে?

আস্তে আস্তে লেবরেটরী ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দোর ভেজানো। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

ঘরের সব জানালা খোলা, ভারি সবুজ পরদা ঝুলছে। কিসের গন্ধ নাকে এল, মিষ্টি গন্ধ। বোধ হয় কিছু ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘরে। প্রথম দিনের মত দেয়ালের অয়েল পেন্টিংয়ের

ওপরে চোখ পড়ল। দেখল রজনীগন্ধার মালা ঝুলছে ছবিতে, হাসি মুখে চেয়ে রয়েছে মাধবী। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ছবির দিকে। সে দিকে চোখ রেখে একখানা চেয়ার টেনে বসল বড় মাইক্রোস-কোপের কাছে। কালো ঢাকা দেয়া যন্ত্রটাতে।

ঢাকার ওপরে হাত বুলাল একটু. মনে মনে যন্ত্রকে প্রশ্ন করল, জীবনের রহস্য, আরও কত রহস্য উদ্ধার করতে তোমার সাহায্য আবশ্যক হয় জানি, কিন্তু যে রহস্য উদ্ধার হচ্ছে কি তার দাম মানুষের মনের কাছে, হৃদয়ের কাছে ?

জাবকোষের চারিদিকে সাইটোপ্লাজমের দেয়াল, তার মধ্যে ভাসমান নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের মধ্যে সূতোর মত ক্রোমো-জোম, তাতে টেপ রেকর্ড করা রয়েছে জেনেটিক কোড। কোটি কোটি জীবকোষ নিয়ে গড়া প্রাণীর দেহ। তার প্রাণবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জীবকোষগুলির নিয়মে।

জীবকোষের স্বয়ংক্রিয় কারখানার কাজ প্রথম চালু হল কি করে ? বাইরে থেকে কেউ চালু করে দিল ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে, না আকস্মিকতা ছাড়া চালু হবার মূলে আর কিছু নাই ?

প্রাণীর প্রাণবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জীবকোষের নিজের নিয়মে, তার চিত্তবৃত্তিও কি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ডিঅক্সিরিবোনিউক্লেয়িক এসিডের দ্বারা ? মানুষের সব কিছু তাহলে এমিনো এসিডের দেয়া ? সারা জীবন রিসার্চ করে এর বেশী কিছু জানতে পারেন না বিজ্ঞানী ?

মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, তার সৌন্দর্যবোধ, ভালবাসা, স্বপ্ন, এগুলো কি ? ডি. এন. আরের ক্রিয়া না ছায়া মাত্র ? বিজ্ঞান এ কোথায় পৌঁছে দিচ্ছে মানুষকে তার জীবন থেকে সব আলো কেড়ে নিয়ে, মনের সব অবলম্বন ঘুচিয়ে দিয়ে ?

চারদিকে যন্ত্রপাতি সাজানো লেবরেটরী ঘরে একা বসে গালে হাত রেখে এই সব কথা ভাবছিল ইন্দ্রাণী, ধীরে ধীরে একটা অজানা ক্ষোভ জমে উঠছিল মনে।

একটা শব্দ কানে আসতে চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

এক হাতে সরবতের গ্লাস অন্য হাতে মিষ্টির ডিশ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডাঃ চক্রবর্তী।

কোমল কণ্ঠে বললেন, তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, আমি জানতাম কোথায় পাওয়া যাবে। খেয়ে নাও।

আপনি কেন আনলেন? আমাকে ডাকলে পারতেন।

তাতে কি হয়েছে?

তারপর বললেন, তুমি অমন করে কি ভাবছিলে খানিকটা বোধ-হয় জানি আমি। খেয়ে নাও, দু'একটা কথা বলব।

ঘরের পরদা টেনে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে চেয়ার টেনে ইন্দ্রাণীর কাছে বসলেন।

বললেন, তোমার মুখে আগেকার হাসি দেখছি না। যে মন জেগে উঠছিল তোমার মধ্যে, পুরোপুরি সে জেগে উঠুক চাইছ না কি? কোথায় বাধা পাচ্ছে বলবে কি?

ইন্দ্রাণী বলল, কি বলব বুঝতে পারছি না। এই ঘরে একা বসে ভাবছিলাম। হয়ত সে ভাবনার মানে নাই, প্রয়োজন নাই, তবু ভাবছিলাম। আপনার বিজ্ঞান কি বলে না দেহ ছাড়া মানুষের সব কিছু অবাস্তব, শুধু ছায়া?

বিজ্ঞান ও সব কিছু বলে না ইন্দ্রাণী। আমার এই হাতখানা কি মালমশলা দিয়ে তৈরী, কি মেকানিজমে হাতখানা ওঠা নামা করে, প্রসারিত হয়, সঙ্কুচিত হয় বিজ্ঞান বলে, হাত দিয়ে আমি কত কি করি, কত কি করতে পারি তা বলা বিজ্ঞানের কাজ নয়। আমার দেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মেকানিজম, দেহের ভেতরের যন্ত্রপাতির বর্ণনা করে বিজ্ঞান, কি ভাবে, কি প্রয়োজনে তাদের কাজ চলে বলে দেয়। দেহের স্বয়ংক্রিয় কারখানার কাজ চলবার ফলে যে মনের উৎপত্তি হয় তার ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধে কিছু বলা বিজ্ঞানের এলাকার বাইরে। দেহাশ্রয়ী হলেও মন আলাদা জিনিস, আলাদা একটা শক্তি। ডায়নামোর কাজ দেখেছ? মেকানিকেল

এনার্জিকে ইলেকট্রিকেল এনার্জিতে পরিবর্তিত করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তামার দড়ির ঘর্ষণে। উৎপন্ন ইলেকট্রিসিটি এবং ডায়নামো-ইলেকট্রিক মেসিন কি এক জিনিস ?

মন দেহ থেকে আলাদা শক্তি, তার কাজ, তার দাবি দাওয়া, তার তৃপ্তি আলাদা।

একটু সময় চুপ করে রইলেন, তারপব বললেন, ইন্দ্রাণী !

বলুন।

আরেক দিন এই ঘরে বসে টেলিস্কোপের কথা বলেছিলে তুমি। টেলিস্কোপ নিয়ে যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কাজ করেন তাঁদের কাছ থেকে মহাশূন্যের খবর শোনা যায়। আর সে খবর অতি বিচিত্র। নীহারিকাপুঞ্জ, তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ, উলকাপিণ্ডের কথা এতদিন জানা ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন কোয়াজার (quasars) বা quasi stellar objects-এর কথা। অবিশ্বাস্য ঔজ্জ্বল্য এদের, অকল্পনীয় পরিমাণ এনার্জি ছড়াচ্ছে এরা, অকল্পনীয় বেগে মহাশূন্যের দূর থেকে দূরান্তে ধাবমান এরা।

সূর্যের গ্রহ নগণ্য এই পৃথিবীর অধিবাসী জরা-মৃত্যুর-অধীন, ক্ষুদ্র মানুষের বুদ্ধি মহাশূন্যের বিরাট রহস্যের আকৃতি-প্রকৃতি জানতে চাইছে, তারকা, গ্রহ-উপগ্রহের রূপান্তরের রহস্য বুঝতে চাইছে। আবার জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রকৃতির লুকানো শক্তির রহস্যও উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে, প্রকৃতির এই শক্তি মানুষের কাজে ব্যবহার করবার চেষ্টা করছে। বস্তুবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, তড়িতবিজ্ঞান, পরমাণুবিজ্ঞান, কত রকমের বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে এই চেষ্টা থেকে।

এদের মূলে রয়েছে মানুষের বুদ্ধি। বুদ্ধিও দেহাশ্রয়ী, প্রাণী-দেহের জীবকোষের স্বয়ংক্রিয়-কারখানায় উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শক্তি।

মানুষের মন ও বুদ্ধি হু'টোই দেহজাত, হু'টোই আবার দেহাতীত। ভাষা ও লিপির সাহায্যে বহু শত বা সহস্র পুরুষের

অভিজ্ঞতাকে উত্তরপুরুষদের কাজের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে শিখে মানুষ মন ও বুদ্ধির সম্পদ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বিজ্ঞানের কাজ ও উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার মনে কোথায় একটু খটকা রয়েছে তাই এত কথা বললাম। খটকা গেল কি না বলতে পারি না।

একটু সময় চুপ করে কি ভাবলেন তারপর হেসে বললেন, আমাকে বন্ধুভাবে নিতে তোমার মন কোথাও বাধা পাচ্ছে কি?

মুখ তুলে তাকাল ইন্দ্রাণী, আপনি যে অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, বিজ্ঞানী, জ্ঞানী, গুণী, শ্রদ্ধার, সম্মানের পাত্র। বন্ধু বলে মনে করতে যে অনেক সাহসের দরকার।

কেমন এক রকমের হাসি ফুটে উঠল ডাঃ চক্রবর্তীর মুখে, বললেন, এ সব কথার জবাব নাই, জবাব দেবার চেষ্টা করব না। আমি তোমাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছি, তোমাকে স্নেহ করি আমি। একটু স্নেহ চাই তোমার কাছে। যদি দেয়া সম্ভব হয় দিয়ো।

যা বলতে চাইল ইন্দ্রাণী বলতে পারল না, মাথা নামিয়ে বসে রইল।

উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ চক্রবর্তী, চলো বাইরে যাই!

এক পরে যাচ্ছি।

আচ্ছা।

খালি গ্লাস ও ডিশটা তুলে নিচ্ছিলেন, বাধা দিল ইন্দ্রাণী, ও কি করছেন, ওতে লজ্জা দেয়া হয় আমাকে।

জিনিস দু'টো তুলে নিয়ে বলল, চলুন।

তাকালেন একবার ইন্দ্রাণীর দিকে।

একটু পরে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে বারান্দায় আসতে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ল।

গ্রামোফোন রেকর্ডের বাজনার সঙ্গে অপু নাচছে। তার বিনুনীতে রজনীগন্ধার মালা জড়ানো, দু'হাতে রজনীগন্ধার বালা,

গলায় রজনীগন্ধার মালা। লাল গোলাপের কুঁড়ি ঝুলছে মালা থেকে লকেটের মত।

অপুর ঘুরপাক নাচ দেখেছ ইন্দ্রাণী, সে যে সত্যি ভাল নাচতে পারে জানত না।

নাচ হচ্ছে রাজার সামনে, মানে মাথায় শাদা চাদরের পাগড়ি বেঁধে রাজা হয়েছেন ডাঃ চক্রবর্তীর মেজ দাদা। তাঁর গা ঘেষে গলায় ফুলের মালা, মাথায় রঙিন রুমাল বেঁধে পাত্রমিত্রেরা, মানে অপুর ছু'ভাই বসেছে।

ডাঃ চক্রবর্তী আগেই এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজদার পেছনে, ইন্দ্রাণী তাঁর পাশে দাঁড়াল।

মুগ্ধ হয়ে অপুকে দেখছিল ইন্দ্রাণী। কেউ তাকে এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন, না সে নিজেই সেজেছে।

পনের মিনিট মত সময় নাচবার পরে রাজার সামনে এসে ছু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম জানাল নর্তকী, তারপর এগিয়ে এসে ডাঃ চক্রবর্তী ও ইন্দ্রাণীকে অমনি করে প্রণাম জানাল।

ডাঃ চক্রবর্তী মিষ্টি করে হাসলেন, ইন্দ্রাণী ছু'হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় চুমো খেল।

রাজা ঘোষণা করলেন, নর্তকী, আমি প্রসন্ন হয়েছি তোমার নৃত্যে। কি পুরস্কার চাই তোমার ?

নর্তকী কাছে এসে রাজার পাগড়ি টেনে খুলে দিল, বলল, একটা ছবি দেখব।

ছুই পাত্রমিত্র হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, আমরাও দেখব।

আসুন ডাঃ সান্যাল, বসুন, ডাকলেন দেবীপ্রসন্ন বাবু, কেমন লাগল নাচ ?

সব ভাবনা চিন্তা উড়ে গিয়েছিল ইন্দ্রাণীর, তাঁর পাশে বসে বলল, চমৎকার, মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। আচ্ছা, অপুকে এমন সুন্দর করে সাজিয়েছে কে, আপনি ?

আমি মালাকর, অপু নিজেই সেজেছে, সাজবার আর্ট মেয়েরা হামাগুড়ি দেবার বয়স থেকে কাল্টিভেট করে কিনা। আপনি প্রোফেসর মানুষ, নইলে মালা টালা একটা কিছু অফার করতাম।

অপু চকোলেটের মোড়ক খোলায় ব্যস্ত ছিল, মি. চক্রবর্তীর এ মন্তব্য শুনলে কিছু বলে উঠত হয়ত।

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ চক্রবর্তীর দিদি এসে জানালেন বাচ্চাদের খাবার দেয়া হয়েছে।

অপু ও তার দু'ভাইকে নিয়ে ভেতরে গেল ইন্দ্রাণী।

তাদের খাওয়া হয়ে গেলে দু'ভাই ও ইন্দ্রাণী একসঙ্গে খেতে বসল। কথাবার্তা চালাতে লাগলেন দেবীপ্রসন্ন বাবু একা।

বিভিন্ন প্রদেশের ভোজ্য, ভোজনরীতি, ভোজন বিলাস ও রন্ধনরীতি সম্বন্ধে বলছিলেন তিনি।

বললেন, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি আমি : বিশেষ রকমের খাদ্যবস্তু ও তার রন্ধনরীতিতে ছেলেবেলা থেকে পারিবারিক অভ্যাসের ফলে কেউ অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেটা মজ্জাগত হয়ে যায়। আমার নিজের শুকতো, ঘণ্টজাতীয় আহার্যের প্রাত প্রীতির মূলে রয়েছে আমার মায়ের রান্না। এর জন্য নিজের পরিবারে গঞ্জনা ও উপহাস সহ্য করতে হয় কিন্তু আমার রসনা ও রসনাশ্রয়ী মন নাচার।

আচ্ছা, ডাঃ সান্যাল,—

ইন্দ্রাণী বলল, কানে বাধছে, আপনি ইন্দ্রাণী বলে ডাকলে খুশী হব।

হেসে বললেন, আমারও মুখে বাধছিল, তোমার অনুমতি পেয়ে খুশী হলাম। হয়ত আর আধ ঘণ্টা পরে বিনানুমতিতে নাম ধরে ডেকে ফেলতাম। সুপ্রসন্নের চেয়ে বাইশ তেইশ বছরের বড় আমি, আমার বড় মেয়ে তোমার চেয়ে দু'তিন বছরের বড় হবে বোধহয়।

উপহাসের কথা কি বলছিলেন ? ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করল।

আমার ঘণ্ট ও শুকতো প্রীতির জন্য আমার দিল্লীওয়ালা স্ত্রী স্বামীকে, পুত্রকন্যারা পিতাকে উপহাস করে। দি ইনফেকশান হ্যাজ্ স্প্রেড। আমার জামাইরা, পুত্রবধূরা উপহাস করে শ্বশুরের পাড়াগেঁয়ে খাদ্যরুচিকে। ইনফেকশানের এরিয়া বেড়ে চলল ক্রমে, দেখলাম আমার আফস কলিগদের, বন্ধুবান্ধবদের, প্রতিবেশীদের পরিবারে ইনফেকশান এপিডেমিকের আকার নিয়েছে। কি ব্যাপার? চক্রবর্তী সাহেবকে নিমন্ত্রণ করতে হচ্ছে, কিন্তু কি খেতে দেয়া যায় তাঁকে, পাড়াগেঁয়ে খাবার ছাড়া অন্য খাবারে তিনি যে অনভ্যস্ত।

ইন্দ্রাণী ও ডাঃ চক্রবর্তী হাসতে লাগলেন।

গল্প এখানেই শেষ হচ্ছে না। ক্রমে দেখলাম ফরীন এম-ব্যাসিতে নিমন্ত্রণ হলে আমাকে শুধু ভেজিটারেনীয়ান ডিশ দেয়া হচ্ছে, যেহেতু আমি ষ্টঞ্চ গাঁধিয়াইট ভেজিটারেনীয়ান। ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিরামিষ খাদ্যের সঙ্গে রকমারি বিদেশী মদের প্রচুর সাপ্লাই থাকত।

ইন্দ্রাণীর হাসি থামতে চায় না।

৮

খাওয়া শেষ হলে কিছুক্ষণ গল্প করে দেবীপ্রসন্ন বাবু বিশ্রাম করতে গেলেন।

ইন্দ্রাণী বলল, আমি কিছুক্ষণের জন্য ছুটি নিচ্ছি, বাবাকে দেখে আসব।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, রোদ একটু কমলে গেলে হত না?

রোদে আমার কষ্ট হয় না।

আমার হয়। গাড়ীটা বের করতে পারি কি?

না। তাতে কথা উঠবে।

কথাকে তোমার খুব ভয় দেখছি। কথা তো এমনি উঠেছে, তোমার কানে পৌঁছয়নি মনে হয়।

চমকে উঠল ইন্দ্রাণী, কি কথা উঠেছে? আপনি কোথায় শুনলেন?

হেসে ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, যাঁরা নূতন কলেজের গভর্ণিং বডিতে আমার নাম দিয়েছেন আমাকে না জানিয়ে, তাঁদের ধারণা তুমি কলেজের প্রিন্সিপাল হচ্ছ জানলে আমার আপত্তি হবে না, যেমন ডাঃ চ্যাটার্জিরও হবে না। আমার আপত্তি হবে না এ ধারণা কেন হল? ছ'একবার আমার বাড়ীতে, আমার গাড়ীতে যাতায়াত করতে দেখা গিয়েছে তোমাকে। ঝড়ের রাতে অজ্ঞান অবস্থায় আমার বাড়ীতে তুমি ঘণ্টা ছুই ছিলে সে কথাও কেউ কেউ জানেন। তোমার বাড়ীর লোকের কাছে এ খবর পেয়েছেন তাঁরা। রাগ করে লাভ নাই, দুঃখ করেও লাভ নাই এ নিয়ে। যাঁরা কথা বলছেন হয়ত তোমার কোন ক্ষতি করবার অভিপ্রায়ও নাই তাঁদের, কাজ আদায়ের সহজ পথ ধরে চলেছেন তাঁরা।

সহজ পথটা কি? একটু তীক্ষ্ণ স্বরে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করল।

তোমার সঙ্গে আমার যখন আলাপ আছে, তোমাকে দিয়ে আমার কাছ থেকে কিছু সাহায্য আদায় করে নেবেন। এ অভি-প্রায়ের মধ্যে মন্দ কিছু নাই, লোকে এ রকম করে থাকে। আমি যে এখানে বাড়ী করেছি তার মূলেও তুমি থাকতে পারো এমন কথাও শোনা যায়।

একটু লাল হল ইন্দ্রাণীর মুখ। আপনি কোথাও বেরোন না এখানে, কারো সঙ্গে আলাপ নাই, এত কথা শুনলেন কোথায়?

হেসে বললেন, আমি না বেরোলেও অপরের আমার বাড়ীতে আসতে আপত্তি কি? কারো সঙ্গে আমার আলাপ নাই তোমার এ ধারণা ঠিক নয়। আমার পয়সা আছে এ কথা যখন রটেছে লোকে আমার সঙ্গে অযাচিতভাবে আলাপ করতে আসবে। এর ভেতরে আমি কিছু মন্দ অভিপ্রায় দেখতে পাই না। এটা স্বাভাবিক, সমাজে অর্থ ও প্রতিপত্তির দাম বরাবর বেশী।

নিজের ঠোঁট কামড়াল ইন্দ্রাণী লক্ষ্য করলেন ডাঃ চক্রবর্তী, বললেন, বেশ, রোদের মধ্যে যাও তুমি, তোমার কষ্ট হবে বলে আমার কষ্ট বোধ করবার দুর্বলতা মার্জনা করতে পারছ না জানি। একটা ছাতা দিতে পারি কি?

না, ছাতা আমি ব্যবহার করি না।

আচ্ছা, তা হলে যাও।

একটা অনুরোধ করছি। আমার হয়ত দেরি হবে ফিরতে, বাসে ফিরে যাব। আপনি যদি দয়া করে অপুদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন—

ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু খালি বাড়ীতে ওদের ছেড়ে দিয়ে আসব কি করে?

বোকা, বোকা, এমন বোকার মত কথাটা বললে কি করে, ইন্দ্রাণীর মন ভৎ´সনা করল তাকে, কার ওপরে রাগ দেখাতে চাও তুমি, কেন চাও?

আচ্ছা, তাহলে তাড়াতাড়ি ফেরবার চেষ্টা করব, বলে বেরিয়ে পড়ল।

ভাগ্য আজ ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পরিহাস করবে স্থির করেছিল।

কিছুদূর যেতে সুকোমল ভৌমিক নমস্কার করল। বলল, এই যে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভালই হল। গভর্ণিং বডির একটা মিটিং ডাকব ভাবছিলাম। ডাঃ চক্রবর্তী ফিরেছেন শুনেছি, দেখা হয়নি। কিছু কথা আছে তাঁর সঙ্গে। আসবার পথে বাড়ীতে দেখলেন কি তাঁকে? এখন গেলে দেখা হবে?

বাড়ীতে আছেন, যান আপনি।

কবে মিটিং হবে চিঠিতে জানাব আপনাকে।

আচ্ছা।

বাড়ীর কাছে দেখা হল শ্রীনৃসিংহদেবদাস ভক্তিবিনোদ গোস্বামীর সঙ্গে। লম্বা, পাকা দাঁড়ি গোঁফওয়ালা সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ।

তাকালেন ইন্দ্রাণীর সাজসজ্জার দিকে, এই রোদে বেরিয়েছ, গাড়ীখানা আনলে পারতে মা। তোমার নিজের না হোক তোমার তাঁবের গাড়ী তো। ডাঃ চক্রবর্তী কি ফিরেছেন?

ফিরেছেন।

একটা কথা বলছি তোমাকে নিজের লোক মনে করে, উনি কি ধর্মকর্ম মানেন, দেবদ্বিজে ভক্তি আছে? টাকার অভাবে মন্দিরের কাজ কিছু বাকী পড়ে রয়েছে—

ওঁর বাড়ীতে যান, দেখা করে বলুন।

বাড়ীতে পাব তাঁকে এখন?

পাবেন।

আচ্ছা, তাহলে যাই। ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন।

নৃসিংহগড়ের এই দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপের ফলে ইন্দ্রাণীর বুঝতে বাকী রইল না ডাঃ চক্রবর্তীর খবর সে রাখে, তিনি বাড়ীতে আছেন কিনা এ খবরটি পর্যন্ত দেবার যোগ্যতম বক্তি সে, এ ধারণা চালু হয়েছে। এতদিন সে ভাবছিল

ক'দিন বা দেখা, কতটুকু বা আলাপ, কারো চোখেই হয়ত পড়েনি। চোখে ভাল ভাবেই পড়েছে। শুধু বুঝতে পারল না এ খবর তাঁর কানে পৌঁছে দিল কে বা কারা। এটাও হতে পারে অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি, দু'চারটে আলগা কথা থেকে বুঝে নিয়েছেন আবহাওয়ার অবস্থা, আর সে কথা তাকে আগে থেকে জানিয়ে আঘাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছেন।

বাড়ী পৌঁছে তার মনের অবস্থা একটু ভাল করবার মত অনুকূল আবহাওয়া দেখতে পেল না।

বাতে পঙ্গু পিতা ঐ রকম রয়েছেন। কন্যার সাজসজ্জা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল. সে কথা কিছু না বলে জানালেন দিদি তার আফিং কেনবার পয়সা দেওয়া বন্ধ করেছেন ক'দিন থেকে, বলেন, সংসার খবচ এত বেড়েছে যে হাতে কিছু থাকে না। তাঁর দুধের পরিমাণও কমিয়ে দিয়েছেন। পেন্সনের যে ক'টা টাকা হাতে আসে তার সবটাই কেড়ে নেন। সে যে টাকা দেয় তার কোন হিসাব দেন না। ছেলেরা এক বোনকে কাছে রেখেছে তাই আর কিছু দেয় না। শেষ বয়সে অনাহারে মৃত্যু তাঁর অদৃষ্টে আছে, ইত্যাদি। তার পর হাত বাড়িয়ে করুণ স্বরে মেয়ের কাছে ক'টা টাকা চাইলেন।

পিসীমা একটু সময় নিলেন দেখা দিতে। পরিষ্কার কাপড় পরে পাড়া বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন, সেখানা বদলে একখানা ময়লা, ছেঁড়া থান পরে বেরোলেন। জানালেন কোমরের পুরনো ব্যথাটা বেড়েছে, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না মাঝে মাঝে। বয়স হয়েছে, দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলবার শক্তি গিয়েছে। আফিংখোর, বাতে খোঁড়া ভ্রাতার জুলুম বেড়ে চলেছে। যে পয়সা হাতে আসে চালানো যায় না তাতে। বললেন, কম বয়সের সুখে শাড়ি, জামা, জুতোয় পয়সা ওড়ায় কেউ, বরাতগুণে গাড়ী, ঘোড়া চড়ে, বুড়ো বাপ, পিসীর দুঃখ কষ্ট চোখে পড়েনা, ইত্যাদি। তারপর বাজার খরচের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে বলে কিছু টাকা চাইলেন।

ব্যাগে তিরিশটা টাকা ছিল। বাপকে দশ টাকা, পিসীকে কুড়ি টাকা দিয়ে বলল, আর ক'দিন বাদে আমি বাড়ীতে ফিরছি, এই দিয়ে চালিয়ে নাও এখন।

নোট দু'খানা কাপড়ের খুঁটে বেধে পিসী বললেন, বোস, এক কাপ চা করে দিই।

না, এখন চা খাব না।

বোস একটু, তুই না খাস আমরা খাব। কি যে খারাপ অভ্যাস হয়েছে, দু'বেলা দু'কাপ না খেলে মাথা তুলতে পারি না।

আমার ফেরবার তাড়া আছে, এখন যাই।

ধমকালেন পিসী, বোস একটু, আসছি এখুনি।

নিজের ঘরে ঢুকলেন।

মিনিট পাঁচ পরে একটা ডিশে কয়েক টুকরো শসা, আধখানা চাঁপা কলা, একটা দরবেশ নিয়ে ফিরলেন, বললেন খেয়ে নে। দু'টো খই আছে, খাবি ?

মাথা নাড়ল ইন্দ্রাণী।

হ্যাঁরে যে চক্কোত্তি সায়েবের বাড়ীতে বেড়াতে যাস তুই তোর মাষ্টারের চেয়ে সে বেশী বড় লোক, না ? কত টাকা আছে তার ?

বিরস মুখে একটু হাসল ইন্দ্রাণী, বলল, আমি কি করে জানব ? কার কত টাকা আছে কেউ বলে নাকি ? তুমি কত জমিয়েছ আমাকে বলো ?

খ্যান খ্যান করে উঠলো পিসী, তোর বাপ বুঝি বলেছে আমি তাকে না খেতে দিয়ে টাকা জমাচ্ছি ? পাড়াশুদ্ধ লোকের কাছে তাই বলে বেড়ায় পোড়ারমুখো। আমার হাতে টাকা থাকলে কি তোদের এই ভূতের সংসারে খেটে খেটে মরি ? কবে কাশী চলে যেতাম।

অতো চেঁচিয়ো না পিসী, আস্তে বললে শুনতে পাই আমি। আচ্ছা, আজ উঠি। আমি ফিরে আসি বাড়ীতে তোমাকে বেশী খাটতে দেব না।

পিতার কাছে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ইন্দ্রাণী, ঘড়িতে দেখল দেড় ঘণ্টা কেটেছে।

ভাবল ও বাড়ীতে যাবে, না, সোজা কলকাতায় ফিরবে? ও বাড়ীতে গেলে ভৌমিক ও ভক্তিবিনোদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। আর ঘণ্টা খানেক সময় যদি কোথাও কাটিয়ে দেওয়া যেত।

ত্ব'জনের সঙ্গে আবার দেখা হল রাস্তায়।

স্থকোমল ভৌমিক জানাল ডাঃ চক্রবর্তী বললেন আসছে রবিবার আপনাকে নিয়ে কলেজের বাড়ী কতটা হয়েছে দেখবেন, তারপর এফিলিয়েশনের দরখাস্ত দেয়া হবে। অন্যান্য কথাও হবে সে দিন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানালেন সে দিন মন্দির দেখতে আসবেন বললেন। তুমিও এসো মা। দেশের ও দশের কাজ, আসতে হয়।

ইন্দ্রাণী ত্ব'জনকে নমস্কার করল, ত্ব'জনকে বলল, আচ্ছা।

পথ চলতে চলতে ইন্দ্রাণী ভাবল কে কত টাকা খসাতে পারবে সেটার আভাস না নিয়ে এঁরা এত শীঘ্র ফিরলেন? হয়ত সে কথা তোলবার সময় দেননি।

তাকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ চক্রবর্তী কলেজের বাড়ী, মন্দির দেখতে যাবেন এঁদের বলেছেন জানা গেল। তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সঙ্কোচের কথা না ভেবে সে যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন।

যদি সে না যায়? যদি সে মনে করে নূতন কলেজে প্রিন্সিপাল হতে চায় না সে, যে চাকুরিতে সে রয়েছে তাইতে থাকতে চায়, চুপচাপ বসে পড়াশোনা করতে চায়, তাহলে? তাহলে আগে থেকে জানিয়ে দেয়া ভাল নয় কি? তাই দেবে সে যদি কথা তোলেন তিনি।

ফটক খুলে ঢুকতে সাদা কুকুরটা দৌড়ে এল, তার হাঁটুর ওপরে সামনের ত্ব'পা রেখে মাথা ঘসল, তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে তাকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল।

ডাঃ চক্রবর্তী কাঁচি হাতে ফুল কাটছেন, নেপালী দারোয়ানের হাতে একটা সাজি, তাইতে সে কাটা ফুলগুলো রাখছে।

বাতাসে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। সাদা রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ ফুল-গুলোর দিকে চাইতে মনের জমানো বিরক্তি কোথায় সরে গেল খুশী হয়ে বলল, এত ফুল তুলছেন কেন?

দু'টি ডাঁটা তার হাতে দিয়ে বললেন, হাতমুখ ধুয়ে দু'একট ফুল পরো মাথায় ইচ্ছা হ'লে, দু'পক্ষ খুশী হবে।

দু'পক্ষ কে?

ফুল ও আমি।

আপনাকে খুশী করবার জন্য ফুল পরতে হবে আমাকে?

দোষ কি? বিজ্ঞানী, জ্ঞানী, গুণী লোক তো? না হয় নিজের খুশীতে পরো।

তাকাল তাঁর দিকে, কথাগুলো মনে করে রেখেছেন?

রেখেছি। ঘেমেছ, হাত মুখ ধুয়ে নাওগে।

ইন্দ্রাণী মনেও করেনি এইটুকু কথায় তার লজ্জা হবে আর, লজ্জা পেয়েও সে হাসবে অমন করে।

ডাঃ চক্রবর্তী তাকালেন তার দিকে।

মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, বললেন, ফুলগুলো নিয়ে যাও।

তাঁর হাত থেকে ফুল নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বারান্দায় উঠে দেখল তিনটি কচি মুখ, উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে মিঃ চক্রবর্তীর গল্প শুনছে। শিকার কাহিনী বলছেন তিনি দু'চারটে কথা কানে যেতে বুঝতে পারল।

ইন্দ্রাণী পাশ কাটিয়ে যেতে একবার তাকালেন; ডাকলেন না। গল্প চলতে থাকল।

ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিল, তারপর গায়ের জামাটা খুলে ফেলল। সত্যি ভিজে গিয়েছিল জামাটা।

বদলি জামা আনেনি। কি করা যায় একটু ভাবল। ড্রেসিং টেবিলের কাছে যে চেয়ারটা ছিল তাতে জামা মেলে দিতে গিয়ে চমকে উঠল। নিজের চেহারা দেখে নয়, কোন্ ঘরে ঢুকেছে সে এতক্ষণ পরে বুঝতে পেরে।

এটা ডাঃ চক্রবর্তীর শোবার ঘর।

বড় আয়নার দু'পাশে দু'খানা ছবি। একখানা মাধবীর ফটো চিনতে পারল, অন্যটি রোম থেকে যে ছবি ডাকে তার কাছে এসেছিল তার কপি, না, তার ফটো।

দু'টি মেয়ের ছবি শোবার ঘরে ঝুলিয়ে রেখেছেন অবিবাহিত, প্রখ্যাত বায়োকেমিষ্ট ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী। একটিকে ভাল বেসেছিলেন, সে মারা গিয়েছে দুর্ঘটনায়। তার দেয়া টাকায় লেবরেটরী গড়ে উঠেছে। দু'ঘরে দু'খানা ছবি টাঙিয়ে তার অপরিশোধ্য ঋণ পরিশোধ করা হয়ে গিয়েছে সম্ভবত। তাই দুর্যোগের রাতে যে আর একটি মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছে তার স্নেহ আদায় করবার চেষ্টা করছেন তিনি।

যাদু আছে তাঁর চেহারায়, তাঁর ব্যবহারে, তাঁর কথায়। যাদু আছে তাঁর বিজ্ঞান ব্যাখ্যায়, অপূর্ব বাজনায়। মোহমুগ্ধ হয়েছে সে মেয়েটি।

একটি মেয়েকে তিনি নিঃশেষ করে সব ভালবাসা দিয়েছিলেন একদিন। আজ আর একটি মেয়েকে দিয়ে তৃপ্ত করতে পারেন এমন অক্ষয় ভালবাসার তহবিল কোথায় মজুত রেখেছিলেন এতদিন?

মাধবীকে ঠকাননি তিনি, তা হলে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মাধবী সব সম্পত্তি তাঁকে দিয়ে যেতে পারত না। কিন্তু অন্য মেয়েটি? সে গরীবের মেয়ে, অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে, কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জন করছে। বিজ্ঞানীর দেউলে হৃদয়ে তার স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হয়েছে?

কেন তার মন বাধা পাচ্ছিল, ভগবানকে ধন্যবাদ, আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পারল। ভগবানকে ধন্যবাদ, ভগবানকে ধন্যবাদ।

সরে যেতে হবে তাকে, যতই শক্ত হোক সে কাজ। দুঃখের মধ্যে মানুষ হয়েছে সে, ভালবাসার আস্বাদ পায়নি। কাঙ্গাল মন লুব্ধ হয়েছিল।

দোরে টোকা পড়ল।

তাড়াতাড়ি ভেজা জামাটা গায়ে দিয়ে নিল। তারপর দোর খুলে দিল।

সহাস্য মুখে ডাঃ চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে। কি বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন।

বললেন, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ? কি হল?

কিছু হয়নি। একটু খারাপ লাগছে শরীর। দয়া করে বাড়ী যাবার—

ব্যবস্থা করছি এখুনি। এক পেয়ালা চা বা কফি খেয়ে নাও ততক্ষণ। অপুদের খেতে দেয়া হয়েছে।

লেবুর রস দিয়ে এক পেয়ালা কড়া কফি নিজে তৈরী করে দিলেন ডাঃ চক্রবর্তী, বললেন, খেয়ে নাও শরীর হালকা হবে।

খেতে বিশেষ সুবিধার না হলেও খেয়ে শরীর সত্যি হালকা বোধ করল অল্প সময়ের মধ্যে। মনের উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেল।

বিদায় নেবার সময় দেবীপ্রসন্ন বাবু বললেন, আজ আলাপ হল না তোমার সঙ্গে, আসছে রবিবারে যদি আসা সম্ভব হয়—

মিষ্টি করে হেসে ইন্দ্রাণী বলল, এত আগে বলতে পারছি না, সম্ভব হলে খবর দেব আপনাকে।

আচ্ছা।

হাতে এক রাশ করে ফুল নিয়ে তিন ভাই বোন গাড়ীতে উঠল।

বাড়ী পৌঁছে ইন্দ্রাণী ডাঃ চক্রবর্তীকে বলল, একটু বসবেন না?

হাতে কিছু কাজ আছে, বসব না। জামা কাপড় বদলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ো।

চলে গেলেন।

শরীর মন কোনটাই খারাপ লাগছিল না ইন্দ্রাণীর। বিশ্রাম নেবার দরকার বোধ করল না। রাতের খাবার সময় পর্যন্ত গল্প করল সবাই মিলে। তারপর খে নিয়ে শুতে গেল।

তিন ভাই বোন ঘুমিয়ে গেলে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে মাসীমার

কুশন দেয়া গোল চেয়ারটাতে বসল ইন্দ্রাণী। ভেবে রেখেছিল নিরিবিলিতে ভাল করে ভেবে দেখবে সব ব্যাপার।

ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখল শক্ত বা ঘোরালো কিছু পাওয়া যাচ্ছে না ভাববার। বিস্মিত হয়ে নিজের মনকে প্রশ্ন করল, তাহলে ডাঃ চক্রবর্তীর শোবার ঘরে মাধবীর ছবির সঙ্গে নিজের ছবি দেখে এত খেপে গিয়েছিলে কেন তুমি?

উত্তর বের করল মন খানিকটা ভেবে নিয়ে। খেপে যাওয়া কথাটা উইথড্র করো। ওটা ভালগার হয়ে গিয়েছে যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে। ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী মাধবীর, ইন্দ্রাণীর ছবি শোবার ঘরে টাঙাবার কোন অধিকার নাই তাঁর। নিজের আঁকা ছবি বলে ভদ্রলোক অনধিকার চর্চা করেছেন খানিকটা। ইচ্ছা করলে উপেক্ষা করা যায় এ ত্রুটি।

উত্তরটা এত ভাল মনে হল ইন্দ্রাণীর যে নিশ্চিন্ত মনে চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙ্গলে বিছানায় গিয়ে শুল।

পরদিন সকাল থেকে কর্মব্যস্ততা শুরু হল, অকেজো কোন কথার মাথায় উঁকি দেবার ফাঁক রইল না।

পরের শনিবারে একটু দেরিতে কলেজ থেকে ফিরল ইন্দ্রাণী। তার ছোট বোন শর্বাণীর অসুখের খবর পেয়েছিল, কলেজের কাজ সেরে দেখতে গিয়েছিল তাকে।

দেখল বাড়ীর সামনে পরিচিত গাড়ী দাঁড়িয়ে, বুঝল ডাঃ চক্রবর্তী এসেছেন। মন খুশী হতে যাচ্ছিল, চোখ রাঙাল ইন্দ্রাণী।

নীচের বসবার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ডাঃ চক্রবর্তীর দু'পাশ দখল করে বসেছে অপুর দু'ভাই। শাড়ি জামায় সেজে লম্বা বিনুনীতে রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে অপু টেবিলের ওপরকার ট্রে থেকে মিষ্টির ডিশটা এগিয়ে ধরে বলছে, খান একটু।

ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকতে বলল, তুমি দেরি করেছ ইনীদি। এক কাপ চা খেয়ে কলেজের জামা কাপড় বদলে এসে বসো। তুমি ফেরোনি শুনে চলে যাচ্ছিলেন ডাঃ চক্রবর্তী, অনেক কষ্টে ধরে রেখেছি।

ডাঃ চক্রবর্তী ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে তার মুখের ভাব দেখে হাসলেন। অকৃত্রিম বিস্ময় ছিল সে মুখের ভাবে অপুর কাণ্ডে।

আমাকে এবার ছেড়ে দিতে হবে অপু, আর বসতে পারব না। ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে বললেন, এক মিনিট ব'সো। মেজদা পাঠালেন খবর নিতে কাল যেতে পারবে কিনা জানতে। যদি যেতে পারো সুকোমল বাবুর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

অপু এককাপ চা ঢেলে এগিয়ে দিয়েছিল। কাপটা তুলে নিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, এই খবর জানাবার জন্য আপনাকে পাঠালেন?

তাইতো পাঠালেন, বললেন, তোমার কাজ থাকলে আমি যাব। ফুল আর মিষ্টি দিলেন অপুদের জন্য।

ইন্দ্রাণীর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল, বলল, কাল যেতে পারব না

তাঁকে বলবেন। মঙ্গলবারে মেসোমশায় মাসীমা ফিরবেন কথা আছে, কাল বাড়ীঘর পরিষ্কার করব, অন্য দিন সময় হয় না।

আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার উঠি।

উঠছিলেন, অপু কাঁধে হাত রাখল, বলল সে হবে না। এত করে সব করলাম আর পাঁচ মিনিট বসতে হবে। বসে মিষ্টির ডিশটা খালি করে তবে যাবেন।

সাহায্য করলে খালি করে দিতে পারব। ডিশটা ইন্দ্রাণীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, একটা নাও।

ডিশ খালি হতে উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ চক্রবর্তী, অপুর ভাইদের গালে হাত বুলিয়ে আদর করলেন, অপুকে কাছে নিয়ে তার পিঠে হাত বুলালেন, বললেন, আসি ইন্দ্রাণী।

চমকে উঠল ইন্দ্রাণী। সে দেখছিল এই গম্ভীর, বিখ্যাত, শান্ত-স্বভাব বিজ্ঞানী কত সহজে ছোটদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারেন। এঁর মেজদার এই গুণ আছে আরও বেশী পরিমাণে। ছোটদের সঙ্গে এত সহজে ঘনিষ্ঠ হতে পারা একটা বড় গুণ।

চমকে উঠল, আসি ইন্দ্রাণী শুনে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার।

প্রতিনমস্কার করলেন না ডাঃ চক্রবর্তী, অপুর পিঠে হাত জড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন, অপুর দু'ভাইও বেরিয়ে গেল।

ডাঃ ও মিসেস চ্যাটার্জি ফিরলেন আমেরিকা থেকে।

অপু ও তার দু'ভাইকে নিয়ে ইন্দ্রাণী দমদমে গিয়েছিল। মালা দিল না তারা। একে একে প্রণাম করল, ইন্দ্রাণীও করল।

ছেলেমেয়েদের চেহারা দেখে খুশী হলেন মাসীমা, ইন্দ্রাণীর চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন, বললেন, এদের এত ভাল ভাবে রেখেছিস, আগে তোকে আদর করি আয়।

হৈ হুল্লোড়ে সারাদিন কেটে গেল। ইন্দ্রাণী দু'টো ক্লাস ছেড়ে দিয়ে সকাল সকাল কলেজ থেকে ফিরে এল।

পরদিন সকাল থেকে দেখা করবার জন্য লোক আসতে লাগল।

সকলের মুখে প্রশ্ন. ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব কি বুঝলেন ? চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে আমেরিকা কি অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে আমাদের ? ইত্যাদি। ডাঃ চ্যাটার্জি ভাষার অদল বদল করে এক রকমের উত্তর সবাইকে দিলেন। বললেন, আমেরিকা হাতির সাইকোলজি ষ্টাডি করছিল, এবার সিদ্ধান্ত করেছে হাতির পিঠে চড়বে। হাতি মানে হাতির মত সাইজ ও হাতির মত অল্পবুদ্ধি ভারতবর্ষ। চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে আমেরিকা ইউ, এন, ও-কে দিয়ে প্রস্তাব পাশ করাবে চীনারা অতি দুষ্ট, অন্যায় কার্য করেছে। বলবে, ভারতবর্ষ পাকিস্তানকে কাশ্মীর ছেড়ে দিলে ইউ. এন. ও-র অনুমতি নিয়ে আমরা পাকিস্তানে অস্ত্র শস্ত্র পাঠাব চীনকে ঠেকাবার জন্য। ভারতবর্ষের হাতে অস্ত্রশস্ত্র পড়লে তার মনোভাব বেয়াড়া হতে পারে। কোন কোন শ্রোতা বলে ফেলেন, আপনার রসিকতা থেকে বুঝে নিতে হবে কি, চীন আমাদের আবার আক্রমণ করলে আমেরিকার কাছে সত্যি সাহায্য পাবার আশা নাই ? ডাঃ চ্যাটার্জি বলেন, ব্ল্যাক মার্কেটের দাম দিতে প্রস্তুত থাকলে আশা করতে পারা যায়। প্রশ্ন হয়. আচ্ছা, রাশিয়াও কি কোন সাহায্য করবে না আমাদের ? করবে বই কি, কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশ তাকে ইজারা দিতে রাজি থাকলে। তার মানে ? মানে, শুধু শুধু, বিনা লাভে, আমাদের হয়ে চীনের শত্রুতা করতে যাবে কেন রাশিয়া ? তাইতো, আমরা যে মনে করি রাশিয়া আমাদের বন্ধু। হ্যাঁ, চীনাদেরও তাই মনে করতাম, এখনও করে অনেকে। ইত্যাদি।

এরপরে কোন কোন মহলে গুজব রটল নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে আমেরিকানরা ডাঃ চ্যাটার্জির মত বিখ্যাত স্কলারকে তেমন খাতির করেনি।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে ডাঃ চক্রবর্তী দেখা করতে এলেন। ঘরে অনেক লোক রয়েছেন দেখে দু'চারটে কথার পরে তিনি বিদায় নিচ্ছিলেন ডাঃ চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, একটু বসুন।

ভেতরে গিয়ে গৃহিণীকে বললেন, ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ করো, আমার ঘরে অনেক লোক দেখে চলে যাচ্ছিলেন, এখানে কোথাও বসাও।

তিন চার মিনিট সময় চাই, গৃহিণী বললেন।

গৃহিণীর অনুমতি পেয়ে ডাঃ চক্রবর্তীকে আনতে গেলেন।

গৃহিণীর বন্ধুরা আসলে তাঁদের বসবার জন্য শোবার ঘরের পাশে চওড়া বারান্দার এককোণে ক'খানা বেতের চেয়ার ও টেবিল পাতা জায়গা ছিল। ক্ষিপ্র হস্তে কুশন, ঢাকা, ফুলদানি দিয়ে, আলো জ্বেলে, দু'মিনিটের মধ্যে জায়গাটার চেহারা বদলে দিলেন গৃহিণী। তারপর সামান্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে ইন্দ্রাণীকে খবর পাঠালেন পাঁচ মিনিট পরে তাঁর কাছে আসতে।

ডাঃ চ্যাটার্জি উপস্থিত ভদ্রলোকদের কাছে ডাঃ চক্রবর্তীর পরিচয় জানাতে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। তাঁর নাম ও খ্যাতি সকলের পরিচিত। তারপর তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, খবর পেলাম আবার নাকি বাইরে যাচ্ছেন।

হ্যাঁ, প্যারিসে একটা কনফারেন্স আছে।

ভেতরে আসতে এগিয়ে এলেন মিসেস চ্যাটার্জি, নমস্কার করে বললেন, আসুন সুপ্রসন্ন বাবু।

তাহলে কিছুক্ষণ বসুন আপনি, বলে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন ডাঃ চ্যাটার্জি।

সামনে হঠাৎ একটি অতি সুন্দর জিনিস দেখলে দরদী মনের লোকের দৃষ্টিতে যে বিস্ময় ও আনন্দ ফুটে ওঠে সেই দৃষ্টি ছিল ডাঃ চক্রবর্তীর চোখে। গৃহকর্ত্রীর আহ্বানে বসবার জায়গায় গিয়ে চেয়ারে বসবার আগে বললেন, আপনি আগে নমস্কার করলেন, প্রতি নমস্কার করতে হল আমাকে, এতে একটু ক্ষুণ্ণ বোধ করছি, কারণ নমস্কার প্রতিনমস্কার মামুলী ভদ্রতার ব্যাপার। এ ভদ্রতা করবার আপনার প্রয়োজন নাই, আমার কাছেও কোন মূল্য নাই এর।

আপনি একটু হেসে বসতে ডাকলে হয়ে যেত।

মিসেস চ্যাটার্জি তাকালেন ডাঃ চক্রবর্তীর দিকে, বললেম, আপনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী, নূতন আসছেন আমার বাড়ীতে, আমার সামনে, চট করে হাসতে যাব কেন মশাই ? যাওয়া আসা করুন, কথাবার্তা বলুন, খাওয়া দাওয়া করুন, তারপর হাসাহাসির অধ্যায় আসবে।

হেসে মুখ একটু নামালেন ডাঃ চক্রবর্তী ।

পেরে উঠবেন না আমার সঙ্গে মনে হচ্ছে, তাই না ? কি করে পারবেন বলুন ? ছাত্রীকাল থেকে ফাজিল মেয়ে বলে আমার দুর্নাম। আমার প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বর্তমান স্বামী ডাঃ চ্যাটার্জি বেশ জানেন সেটা, আপনিও জানতে পারবেন যদি আসা যাওয়া করেন। এক মিনিট বসুন।

ইন্দ্রাণীকে আসবার জন্য তাগিদ পাঠালেন। যে সন্দেহ তাঁদের স্বামী স্ত্রী দু'জনের মনে উদয় হয়েছিল তার কোন ভিত্তি আছে কিনা জানা প্রয়োজন !

প্রেরিত লোকের সঙ্গে ইন্দ্রাণী আসছে দেখে বসবার জায়গার আলোটা চট করে নিভিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। বললেন খাবার ঘরে থেকে সরবৎ আর মিষ্টি নিয়ে আয় আমার এক বন্ধুর জন্য। ইন্ট্রোডিউস করে দেব তোর সঙ্গে ?

কে মাসীমা ?

পরে শুনবি, খাবারটা নিয়ে চলে আয় শীগগির।

একটু বাদে ইন্দ্রাণী খাবার নিয়ে আসছে দেখে আলোটা জেলে দিয়ে বললেন, এখানে দে।

ইন্দ্রাণী দেখল ডাঃ চক্রবর্তীকে। ভাবল মাসীমার সঙ্গে তাঁর কবে এত আলাপ হল যে তাঁকে ভেতরে এনে বসিয়েছেন ?

সরবৎ ও মিষ্টি সামনে নামিয়ে রেখে বলল, ভাল আছেন ?

ভাল আছি, তুমি ভাল আছ ?

ভাল আছি।

মাসীমা বললেন, বোস এক, এখানে, আলাপ কর। আমি আসছি।

চলে গেলেন।

ইন্দ্রাণী সরবং ও মিষ্টি তাঁর সামনে সরিয়ে দিয়ে বলল, খেয়ে নিন। আপনার মেজদা ভাল আছেন? নানা ঝামেলা, কলেজের কাজ বেড়েছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় হয় না।

ঝামেলা কিসের? ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

হাসল ইন্দ্রাণী, অনেক দিক দেখতে হয় কিনা আমাকে, অনেকের কথা ভাবতে হয়। ভেবেছিলাম থিসিসের হাঙ্গামা মিটে গেলে সময় পাব হাতে, পড়াশোনা করব, বই লিখব, হয়ে উঠছে না। মাসীমার সঙ্গে আলাপ করলেন?

ডাঃ চ্যাটার্জি ভেতরে নিয়ে এলেন আলাপ করবার জন্য। ওঁকে দেখলে মন ভাল হয়ে যায় বুঝতে পারলাম আজ, এটা অসাধারণ গুণ

ইন্দ্রাণী তাকাল তাঁর দিকে।

কাউকে চোখের সামনে দেখলে যদি মন ভাল হয়ে যায়, বুঝতে হবে সংসারের বিক্ষোভ, দ্বন্দ্ব, সংশয় পার হয়ে এমন জায়গায় উনি পৌঁছে গিয়েছেন যে সহজে মনের প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হয় না ওঁর। মন ভাল হওয়া মানে ওঁর দিকে চেয়ে বিক্ষুব্ধ মন আশ্বাস পায়, শান্তির সন্ধান পায়। সহজ হল কি?

মাথা নামাল ইন্দ্রাণী, মৃদুকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, শক্ত জিনিস সহজ করে বোঝাবার শক্তি আপনার আছে জানি।

তোমার কথা মেনে নিতে পারলাম না ইন্দ্রাণী। হয়ত মনে হয়েছে জানো কিন্তু বিশ্বাস করোনা সত্যি বলে। বিশ্বাস করলে তোমার নিজের কোন সমস্যা সরিয়ে রাখতে না আমার কাছে থেকে।

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে তাকাল, কি বলবে ভেবে পাচ্ছেনা মনে হল।

মিসেস চ্যাটার্জি ফিরলেন। চেয়ার টেনে বসে কি বলছিলেন হুপ দাপ শব্দ করে অপু এসে পড়ল। ডাঃ চক্রবর্তীর কাছে দাঁড়িয়ে বলল, ফুল কোথায়?

মিসেস চ্যাটার্জি দেখলেন ভদ্রলোকের মুখ চোখ এক পলকের

মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশীতে। হাত বাড়িয়ে অপুকে কাছে টেনে বললেন, তোমার দেখা পাব মাথায় আসেনি অপু, ফুল আনা হয়নি। ত্রুটি হয়েছে। কাল তোমার ফুল পোঁছে যাবে দেখো।

এক হাত তাঁর কাঁধে রেখে অপু খুশী হয়ে বলল, ঠিক আছে। এখন খান তো দেখি।

একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরল।

মিসেস চ্যাটার্জি দেখলেন, ইন্দ্রাণীও দেখল, অপু তাঁকে দুটো মিষ্টি, সরবৎ খাইয়ে দিল। বলল, পান খাবেন?

পান আনতে দৌড়চ্ছিল আটকালেন ডাঃ চক্রবর্তী, না অপু, পান খাইনে।

এবার গল্প করুন মার, ইনীদির সাথে।

নাচতে নাচতে চলে গেল।

মিসেস চ্যাটার্জির দিকে চেয়ে হেসে ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, আপনার ছেলে মেয়ে তিনটি ভারি মিশুক। আমার মেজদার সঙ্গে ওদের খুব ভাব। অপু বেশ মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে হবে, মায়ের মত।

চক্রবর্তী সাহেব, অপুর আদর করল, খাইয়ে দিল তার কথা হয়ত বলতে পারেন, তার মায়ের কথা বলছেন কি করে?

হাসলেন ডাঃ চক্রবর্তী, আপত্তি থাকলে কথা ফিরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু তাতে সত্যি কথাটা মিথ্যা প্রমাণ হবে না।

আমার প্রশ্ন, কথাটা যে সত্যি জোর করে বলছেন কি ভরসায়?

চোখে যা পড়ে না এমন জিনিস নিয়ে আমি নাড়া চাড়া করি, তার সম্বন্ধে যা বলি লোকে সত্যি বলে মেনে নেয়। চোখে যা পড়ে, তার সম্বন্ধে যা বলি, সেটা মিথ্যা হবে কেন?

হাসি চেপে মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, এ প্রসঙ্গ থাকল। এই ইন্দ্রাণী মেয়েটির স্বভাবে মিষ্টতার সন্ধান পায় কি আপনার মাইক্রোসক্রোপিক দৃষ্টি?

হয়ত কিছু পায়। এ প্রসঙ্গটাও থাক না মিসেস চ্যাটার্জি?

তারপর বললেন, আপনাকে আরেক দিন আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারলে খুশী হতাম কিন্তু চারদিন পরে আমি বাইরে যাচ্ছি, কতকগুলো কাজ সেরে রাখতে হবে, সময় করতে পারব না। ফিরে এসে—

কোথায় যাবেন? কতদিনের জন্য?

ফ্রান্সে যেতে হবে, দিন পনেরোর জন্য, তার পর আর ছ'চারটে জায়গায় যাবার কথা আছে। মাস ছুই লাগবে মনে হয়।

বেশ, আপনি ফিরে আসবার পরে আপনার বাড়ীতে যাব।

আজ তা হলে উঠি। ডাঃ চ্যাটার্জিকে আর বিরক্ত করব না।

উঠে দাঁড়ালেন তিন জন।

মিসেস চ্যাটার্জি বললেন, আচ্ছা আসুন। ইন্দ্রাণী পথ দেখিয়ে নিয়ে যা চক্রবর্তী সাহেবকে।

ইন্দ্রাণী গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়েছিল।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, এত গম্ভীর হয়ে থাকতে হবে এমন কিছু বলিনি তোমাকে ইন্দ্রাণী। আচ্ছা চলি।

গাড়ী চলে গেল।

ইন্দ্রাণী টের পেল তার ছ'চোখ জ্বালা করছে।

তুমি খুকী নাকি? বলে রাগ করে ধমকে দিল নিজেকে।

পরদিন সকালে সুকোমল ভৌমিক এল ডাঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ইন্দ্রাণীকে ডেকে পাঠালেন। কলেজের ব্যাপার কিছু জানতেন না তিনি, প্রশ্ন করে করে খুঁটিয়ে সব শুনলেন।

সুকোমল ভৌমিক বলল, ডাঃ সান্যাল প্রিন্সিপাল হবেন, আপনার, চক্রবর্তী সাহেবের মত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সাহায্য পাব এই ভরসায় এত বড় কাজে হাত দিয়েছি আমি। আমি নিজে মুখ্যু লোক, টাকা পয়সা যা পারি খরচ করতে রাজি আছি।

ডাঃ চ্যাটার্জি বললেন, বাড়ীটা শেষ করুন আগে। দেয়াল দেখিয়ে এফিলিয়েশন পাওয়া যাবে না। সুবিধা মত ইন্দ্রাণীকে নিয়ে যাব একদিন বাড়ী দেখতে, আগে খবর দেব।

এর পরের এক রবিবারে ইন্দ্রাণী বাড়ীতে এল বাবাকে দেখতে ও কিছু টাকা পিসীর হাতে দিতে।

কাজ সেরে বাইরে আসতে দেখল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে পড়ল এর আগে একদিন শুনেছিল সেবাইত পদ থেকে ঠাকুরকে সরাবার জন্য আন্দোলন চলছে পল্লীতে। নানা রকমের অভিযোগ উঠেছিল তার সম্বন্ধে। দুশ্চরিত্রতার অভিযোগও ছিল তার মধ্যে।

কোন ভূমিকা না করে ঠাকুর বলল, চক্কোত্তি তোমায় কথায় ওঠে বসে শুনি, তাকে কি বলেছ আমার বিরুদ্ধে ?

আমি কলকাতায় থাকি, তাঁর সঙ্গে দেখা দেখা সাক্ষাৎ হয় না, কথাবার্তাও হয় না।

ও সব কথা রেখে দাও। আমার লোক দেখেছে প্রায় রাত্রে গাড়ী করে তার সঙ্গে কলকাতায় যাও তুমি। ভৌমিকের কলেজে সে টাকা দেবে বলেছে, দেবত্তার মন্দিরের জন্য কেন দেবে না ? দিতে না করেছ তুমি ?

আমি না করতে যাব কেন ? পাড়ার লোক দিতে নিষেধ করেছে কি না খবর নিন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চিৎকার করে বলতে লাগল, সব শালা আমার নামে মিথ্যা রটাচ্ছে, তুমিও তাদের দলে আছ। দেখে নেব আমি তো—

হঠাৎ বাক্‌স্রোত বন্ধ হল। ইন্দ্রাণী দেখল এক গাছা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে তার পঙ্গু পিতা বেরিয়ে এসে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েছেন, কর্কশ গলায় বললেন, আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে আর একটা কথা বলবে কি তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব। চলে যাও এখান থেকে, ব্যাটা ছোট লোক, ইতর।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দেখল লাঠি উঁচিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে রমেশ সান্যাল, ক্রোধে জ্বলছে দু'চোখ। গোঁয়ার বলে দুর্নাম আছে লোকটার। চুপ চাপ চলে গেল সে নিজের বাড়ীর দিকে।

বাড়ী আয় ইন্দ্রাণী, আমি তুলে দিয়ে আসব বাসে।

ইন্দ্রাণী বলল, তুমি ঘরে যাও বাবা। কোন ভয় নাই তোমার, আমি ঠিক চলে যাব।

পিতাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিল, লাঠি গাছা ঘরের কোণে রেখে দিল, এক গ্লাস জল কুঁজো থেকে গড়িয়ে তাঁকে দিল, তারপর হেসে বলল, তুমি কিছু ভেবো না বাবা, আজ আসি।

হন হন করে হাঁটতে লাগল ইন্দ্রাণী। কিছু দূর গিয়ে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দাঁড়াল, দেখল সুকোমল ভৌমিক আসছে।

কাছে এসে নমস্কার করে বলল, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি গোলমাল করছিল এইমাত্র শুনলাম—

ও কিছু না। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

চলুন, আপনার সঙ্গে বাসষ্টপ পর্যন্ত যাই।

কোন দরকার নাই সুকোমল বাবু, একা যাতায়াত করা আমার অভ্যাস আছে।

চক্রবর্তী সাহেবের ফিরতে মাস দুই হবে কি?

তাই তো বললেন সেদিন।

ইন্দ্রাণী দ্রুত পায়ে চলে গেল, সুকোমল ভৌমিক কি ভাবতে ভাবতে ফিরে চলল।

বেশ খুশী মনে হাঁটছিল ইন্দ্রাণী, একটা চমৎকার জিনিস দেখেছে সে আজ। তার বাতে পঙ্গু, আফিংখোর, বৃদ্ধ পিতা যৌবনের তেজ নিয়ে লাঠি হাতে বেরিয়ে এলেন মেয়েকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য। ভারি সুন্দর জিনিস।

ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময়ে একবার তাকিয়ে দেখল, মনে হল কেউ নাই বাড়ীতে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন মনে এল, ডাঃ চক্রবর্তী ঘটনা স্থলে থাকলে অপমান থেকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতেন কি? নিজেই উত্তর দিল, করতেন সম্ভবত।

এরপর নিজে এক অদ্ভুত কাণ্ড করল।

বাড়ীর ফটকে দাঁড়িয়ে লোহার গেট ঠেলে দেখল তালা বন্ধ, ডাকল, বাহাদুর!

ফটকের সংলগ্ন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে পকেট থেকে চাবি নিয়ে তালা খুলে সেলাম করে এক মুখ হাসল বাহাদুর।

কিছু ফুল দাও আমাকে।

একটা বেতের মোড়া এনে সামনে রেখে বলল, বৈঠিয়ে।

কাঁচি নিয়ে অনেকগুলো রজনীগন্ধার ডাঁটা কেটে দড়ি দিয়ে ডাঁটাগুলো জড়িয়ে বেঁধে এনে ইন্দ্রাণীর সামনে ধরল।

ফুল নিয়ে ইন্দ্রাণী হেসে বলল, অনেক ফুল। আচ্ছা আসি, তুমি গেট বন্ধ করে দাও।

আবার সেলাম করল বাহাদুর।

ইন্দ্রাণী বেরিয়ে গেলে ফটকে তালা দিল।

হাঁটতে হাঁটতে ইন্দ্রাণী মনকে বোঝাল অপুদের দেব বলে ফুলগুলো নিলাম, ওরা খুশী হবে।

মন বলল, তারপর?

ইন্দ্রাণী বলল, তারপর? তারপর আর কি থাকছে? মালিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাগান থেকে ফুল নিলাম। কেন নিলে? মালিক ফুল দেবার লোক পেলে খুশী হন জানো না কি? না বলে কেউ ফুল নিলেও খুশী হবেন? হবেন, হবেন; আর বক্‌বক্ ক'রো না।

পরদিন রাত্রে খাবারের সময়ে ইন্দ্রাণী ডাঃ ও মিসেস চ্যাটার্জিকে জানাল তাদের কলেজের হষ্টেলে সুপারের পদের অফার পেয়েছে সে, নিতে চায়। আলাদা একটা ঘর পাবে, ভাড়া লাগবে না, পারিশ্রমিক বলে কিছু পাবে। হষ্টেল কলেজের কাছে, যাতায়াতের কষ্ট ও খরচ বেঁচে যাবে।

বলল, আপাততঃ সে বাড়ী ফিরবে না। টাকা নিয়মিত পেলে তার বাবা খুশী থাকবেন।

মেসোমশাই ও মাসীমা দু'চারটে প্রশ্ন করলেন, কিছু আলোচনা করলেন, শেষে মত দিলেন। পরদিন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল সে রাজি। কিছু আপত্তি উঠেছিল অপুদের পক্ষ থেকে। দু'চারটে মিষ্টি কথা বলে সেটা কাটিয়ে দিল।

দু'দিন পরে সে হস্টেলে চলে গেল।

১০

নিজের কাজ পছন্দ হল ইন্দ্রাণীর। ঘরটাও পছন্দ হল।

কলেজ থেকে তিন চার মিনিটের পথ। ধাক্কাধাক্কি করে ট্রামে বাসে চড়বার বিড়ম্বনা নাই।

কিছু কিছু জিনিসপত্র কিনে, বাড়ী থেকে দরকারী বইগুলো এনে স্থির হয়ে বসল। ভাবল এবার মন দিয়ে পড়া শোনা করবে, থিসিসটা ছাপাবে, নূতন বই লিখবে।

দু'টো দায় তার আছে। ছোট বোনের বিয়ের জন্য কিছু টাকা জমাতে হবে আর তার বাবা যত দিন আছেন তাঁর খরচ কিছু দিতে হবে মাস মাস। টাকা কিছু জমেছে, আর বছর খানেক পরে দাদাদের হাতে হাজার তিন টাকা দিতে পারবে শর্বাণীর বিয়ের জন্য।

কলেজ করে, পড়াশোনা করে, হস্টেলের মেয়েদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ করে সন্ধ্যার পরে। অপুদের নিয়ে মাসীমা দু'একদিন বেড়াতে আসেন, সেও মাঝে মাঝে যায়। ছোট বোন শর্বাণী আসে দু'একদিন। বেশ দেখতে হয়েছে সে। দিন কেটে যায় এই ভাবে।

ডাঃ চক্রবর্তী বিদেশে। তাঁর কথা কি মনে পড়ে না? পড়ে বই কি। তবে তাঁর কথা নিয়ে বেশী ভাবতে অনিচ্ছুক ইন্দ্রাণী। তার ভাবখানা এই যে জীবনে চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা পেছনে ফেলে এসেছে সে। সে অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছে, তার জের টানবার কোন অর্থ হয় না।

ডাঃ চক্রবর্তী জানিয়েছেন তিনি স্নেহ করেন তাকে, একটু স্নেহ চান তার কাছে। এ কথা তো মিথ্যা নয় স্নেহ সে দিয়েছে, রক্ত মাংসের মানুষ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তীকে নয়, তার স্নেহ দিয়েছে সে তার নানা বিড়ম্বনা, দৈন্য-পীড়িত জীবনের রূপকথার হিরোকে, যাঁর আবির্ভাবে ধূলিমলিন পৃথিবীর এক অন্ধকার কোণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ক'টা মুহূর্তের জন্য, নীল আকাশ থেকে নরম আলো ঝরে পড়েছিল, মিষ্টি হাওয়া দোলা দিয়েছিল দেহে। সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী মাধবী নামে একটি মেয়ের প্রেমাস্পদ, অন্য একটি মেয়ের প্রেমাস্পদকে দূরে থেকে যতটা স্নেহ দেয়া যায় দিয়েছিল সে, অন্যায় করছে জেনেও, অবাধ্য মনকে শাসন করতে পারেনি। অনেক কষ্টে শাসনে এনেছে মনকে কিন্তু বুঝতে পারে না কেন তাঁর কথা মনে হলে লুকোনো কাঁটার ব্যথা অনুভব করে সে। কতকাল এই ব্যথা বয়ে বেড়াতে হবে তাকে কে জানে?

নৃসিংহগড়ে যেতে ইচ্ছা করে না তার। সেখানে নূতন কলেজ কখনও হলে যে কোন পদ নিয়ে হোক সেখানে যাবে কিনা সন্দেহ। তবু যেতে হয় সেখানে বাবার জন্য।

একবার গিয়ে খবর পেল দু'দিন আগে কারা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে লোহার রড দিয়ে মেরে। রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এখন হাসপাতালে আছে। অবস্থা ভাল নয়। পুলিশ দু'টি ছেলেকে ধরেছে সন্দেহ করে।

ফেরবার পথে বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসের অপেক্ষায় একখানা প্রাইভেট গাড়ী এসে দাঁড়াল কাছে, গাড়ী থেকে মুখ বের করে কে ডাকলেন, ডাঃ সান্যাল, ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্রাণী দেখল ডাঃ চক্রবর্তীর মেজদা দেবীপ্রসন্ন বাবু ডাকছেন।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন, কলকাতা যাচ্ছো তো, এসো গাড়ীতে।

গাড়ী চলতে লাগল। ইন্দ্রাণী বলল, বাড়ী বন্ধ দেখেছিলাম মাঝখানে, আপনি কবে এলেন?

দিন পাঁচ আগে। তোমার খোঁজ করেছিলাম। সুকোমল ভৌমিক বলল ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ীতে রয়েছ এখনও।

ওঁরা ফিরেছেন। সপ্তাহ দুই হল আমাদের কলেজের একটা হষ্টেলে গিয়েছি। আমার খবর করেছিলেন কেন?

তোমাকে দেখতে। অন্য কথাও ছিল। একটা কথা এই যে ভৌমিকের কলেজে তুমি প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসছ সে বলল। এ কথা ঠিক?

হেসে ইন্দ্রাণী বলল, আমাকে না জিজ্ঞেস করে সুকোমল বাবু আমাকে প্রিন্সিপালের পদ দিয়ে, ডাঃ চক্রবর্তী, ডাঃ চ্যাটার্জিকে আগে না জানিয়ে গভর্নিং বডির মেম্বার করে নিয়েছেন। কলেজ হবে কিনা তাই তো ঠিক নাই।

কলেজ হবে। সুকোমল ভৌমিক আমার সঙ্গে দেখা করেছে দু'তিন বার। তাকে ভাল করে বাজিয়ে দেখেছি। কলেজের ব্যাপার সে আমার হাতে ছেড়ে দিতে রাজি আছে দেখলাম। আমি এবার নৃসিংহগড়ের স্থায়ী অধিবাসী হব মনে করছি।

শুনে আনন্দ প্রকাশ করল ইন্দ্রাণী। বলল, তা হলে পল্লীর চেহারা ফিরে যাবে।

সে চেষ্টা করতে হবে। ভায়ার মাথা মোজেইক ভিরাসে ভর্তি, মিছে তাকে এসব কাজে নামাতে চেষ্টা করছিল ভৌমিক। আমি রিটায়ার্ড লোক, সময়ের অভাব নাই, উৎসাহেরও অভাব নাই। গোড়াতেই আসতে পারত আমার কাছে।

মোজেইক ভিরাসটা কি ব্যাপার?

তামাকের পাতায় এক রকমের ব্যারাম হয় ভিরাসের আক্রমণে। পাতায় মোজেইকের টালির মত নক্সা দেখা যায়। তাই থেকে ব্যারামের নাম হয়েছে মোজেইক ভিরাস। ইন্দ্রাণী—

বলুন।

দেখো, আমি এখানে এসে বসেছি বটে কিন্তু একেবারে একা, ভাল লাগছে না। রবিবারে রবিবারে তুমি আসতে পারো না? সকালে

আসবে, খাবে, ঘুমুবে, গল্প করবে, সন্ধ্যার সময় পৌঁছে দিয়ে আসব। চ্যাটার্জির ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আনতে পারো। চ্যাটার্জি দের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, নইলে উইক এণ্ড কাটাবার নিমন্ত্রণ করতাম।

ইন্দ্রাণী বলল, আপনার তো সবাই আছেন, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, তবু একা এখানে থাকতে চান কেন ?

হাসলেন দেবীপ্রসন্ন বাবু, ভারি বোকা মেয়ের মত প্রশ্ন করলে। ছেলে মেয়েরা নিজেদের পথ দেখে নিয়েছে। তাদের নিজেদের সংসার আছে, নিজেদের নিয়ে তারা ব্যস্ত। গৃহিণী এত দিন নয়া দিল্লীর গরমে ছিলেন, পয়সার ঘাটতির ফলে সে গরম কেটে গিয়েছে, গুরুদেবের স্মরণ নিয়েছেন। বুড়ো দেবীপ্রসন্নকে মাঠে হাম্বা হাম্বা করে চরতে ছেড়ে দিয়ে আনডিষ্টার্বড্ ভগবদ্-চিন্তা করছেন। হাম্বা কথার মানে জানো ?

মানে কি ?

মানে হায় আম্বা। আম্বা মানে মা, দক্ষিণীদের আম্মা, মারাঠিদের অম্বা। তাহলে কি দাঁড়াল ? শেষ কথা হায় মা, হায় মা তারা, দাঁড়াই কোথা ?

ইন্দ্রাণী হাসতে লাগল।

হাসি থামিয়ে বলল, চলুন ভবানীপুরে, ডাঃ চ্যাটার্জি মানে আমার মেসোমশাই মাসীমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর হস্টেলে ফিরব।

ছেলে মেয়েদের নিয়ে ডাঃ চ্যাটার্জি ছবি দেখতে গিয়েছিলেন।

মাসীমাকে দেবীপ্রসন্ন বাবুর কথা জানিয়ে বলল, আমি নিয়ে এসেছি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য।

সামান্য কিছু খাবার নীচে নিয়ে যেতে বলে দিয়ে মিসেস চ্যাটার্জি নীচে বসবার ঘরে গেলেন।

ইন্দ্রাণী সবিস্ময়ে দেখল পাঁচ মিনিট সময় লাগল না দেবীপ্রসন্ন বাবুর মাসীমাকে তুমি এবং মা বলে কথা বলতে।

খাবার ও সরবৎ এল।

বুড়ো মানুষ, আর কোন নিয়ম মানি না, খাওয়ার নিয়ম একটু মেনে চলি মা। প্রথম তোমার বাড়ীতে এলাম, ফিরিয়ে দেব না, সরবৎটা খাই।

ডিশটা ইন্দ্রাণীর দিকে ধরে বললেন, রাস্তায় তোমাকে কুড়িয়ে পেলাম, কিছু খেতে দিতে পারিনি, এইটে খেয়ে নাও দিকি।

পারের রবিবারে তাঁর বাড়ীতে চা খাবার জন্য সপরিবারে মিসেস চ্যাটার্জিকে নিমন্ত্রণ করলেন দেবীপ্রসন্ন বাবু।

বিদায় নেবার জন্য উঠলেন, দেবীপ্রসন্ন বাবু, বললেন, এই মেয়েটিকে তার হষ্টেলে পৌঁছে দেব বলেছি, নইলে আর একটু বসতে পারতাম। তারপর বললেন, কোন দোষ করলাম না তো মা এভাবে তোমার বাড়ীতে হামলা করে ?

মিসেস চ্যাটার্জির মাথার কাপড় সরে গিয়েছিল, আর উঠাননি, এখনও উঠালেন না, এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন বৃদ্ধকে, বললেন, মেয়েকে ও রকম বলতে নাই।

ইন্দ্রাণী বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকাল তার অনেক দিনের পরিচিত মাসীমার দিকে।

ইন্দ্রাণীকে হষ্টেলে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার সময়ে বললেন, তুমি সকালে এসো ইন্দ্রাণী, একটু সাহায্য করবে বুড়োকে, ওঁদের চা খেতে বলেছি।

রবিবারে চা পার্টিতে ডাঃ চ্যাটার্জির বাড়ীর সবাই এসেছিলেন, দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীর কাউকে দেখা গেল না। ইন্দ্রাণী শুনল ভবানীপুরের বাড়ীর পুরনো রান্নার ঠাকুরটি এসেছে চপ, মিষ্টি, ডালপুরী তৈরী করবার জন্য।

ইন্দ্রাণী মাসীমাকে বাড়ী ঘর দেখাল, লেবরেটারী ঘর খুলিয়ে লেবরেটারী দেখাল, দেয়ালে টাঙানো মাধবীর ছবি দেখাল। শোবার ঘরে বড় আয়নার দু'পাশে দু'খানা ছবি দেখে একটু হেসে ইন্দ্রাণীর দিকে চাইলেন, বললেন, তোর এ ছবি কবে তোলা হয়েছিল ?

উত্তর দিতে গিয়ে একটু লাল হল মুখ, বলল, তোলা হয়নি, এঁকেছেন।

আর কিছু বললেন না মাসীমা।

ছেলে মেয়েরা বাগানে দৌড়াদৌড়ি করছিল, মিসেস চ্যাটার্জি বাড়ী ঘর দেখছিলেন, ডাঃ চ্যাটার্জি আর দেবীপ্রসন্ন বাবু বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন।

গল্প দেবীপ্রসন্ন বাবু করছিলেন, ডাঃ চ্যাটার্জি মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলেন ও শুনছিলেন। নিজের চাকুরি জীবন, নয়া দিল্লীর কথা, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গলদ, শাসন ব্যবস্থায় রাজ-নীতিকদের হস্তক্ষেপ, দেশের পররাষ্ট্রনীতির গলদ, মেজরিটি পার্টি গভর্ণমেণ্টের সভ্যদের মধ্যে নানা ধরণের কমপ্লেক্স, এই সব নিয়ে গল্প চলছিল।

নিমন্ত্রিতরা বিদায় নিতে রাত আটটা বেজে গেল। ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ডাঃ ও মিসেস চ্যাটার্জি হষ্টেলে পৌঁছে দেবেন বলে।

পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে চা পার্টির পরে, সে দিন শনিবার।

বারোটার পরে তার ক্লাস, ইন্দ্রাণী সকালে নিজের ঘরে বসে পড়াশোনা করছিল। খবর এল গাড়ী করে ছ'জন ভদ্রলোক আর একটি মেয়ে এসেছে, ওপরে আসলেন না, তাকে ডাকছেন। কারা এলেন বুঝতে পারল না ইন্দ্রাণী, ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে গেল।

অবাক হয়ে দেখল গাড়ীতে সুকোমল ভৌমিক, দেবীপ্রসন্ন বাবু ও তার ছোট বোন শর্বাণী বসে।

ইন্দ্রাণীকে দেখে ছ'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ করল শর্বাণী। দেবীপ্রসন্ন বাবু তার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন ইন্দ্রাণী দেখল।

সুকোমল ভৌমিক জানাল কাল সন্ধ্যাবেলা নৃসিংহগড়ের বাসষ্টপের কাছে পুলিশ শর্বাণীকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। অভিযোগ মারপিট। একটি ছেলেকে সে মেরেছিল। পুলিশ

তাকেও ধরে থানায় নিয়ে যায়। অনেক রাতে লোকের মুখে সে খবর পায়, কিন্তু শর্বাণীকে ধরেছে জানত না। আজ সকালে রমেশ বাবু জানালেন শর্বাণী কাল বাড়ীতে এসেছিল, সন্ধ্যার আগে চলে যায়। যে ছেলেটিকে ধরেছিল তার বাড়ীতে কিছু খবর পাওয়া গেল। মি. চক্রবর্তীকে নিয়ে থানায় গিয়ে দু'জনকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। ছেলেটি বণ্ড সই করে বাড়ী গিয়েছে। শর্বাণী তার নামে যে অভিযোগ করেছিল পুলিশ লিখে নিয়েছে, কেস হবে তার নামে। শর্বাণী নৃসিংহগড়ে বা কলকাতায় তার দাদার বাড়ীতে যেতে অস্বীকার করায় তাকে হস্টেলে আনা হয়েছে।

ইন্দ্রাণী বলল, নেমে এসো শর্বাণী।

কাঁদতে কাঁদতে নেমে এল শর্বাণী, দিদির দু'পা জড়িয়ে ধরে বলল, আমি কোন দোষ করিনি দিদি।

আচ্ছা, শুনব সব, কাঁদিস নে।

দেবীপ্রসন্ন বাবু নেমে এলেন। শর্বাণীকে উঠিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কাঁদিস না শর্বাণী, তুই বাহাদুর মেয়ে।

তারপর বললেন, আজ ও তোমার কাছে থাক, কাল সকালে গাড়ী আসবে তোমাদের দু'জনকে নৃসিংহগড়ে নিয়ে যেতে।

এই সময়ে ইন্দ্রাণীর মেজদা এসে পড়ল সেখানে।

শর্বাণীকে দেখে গালাগাল করতে লাগল, সিনেমা দেখবে বলে কাল বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলে তুমি, কোথায় গিয়েছিলে? কোথায় ছিলে রাতে?

সুকোমল ভৌমিক বলল, পুলিশ লক আপে ছিল, আজ সকালে খালাস করে আনা হয়েছে। কোন চিন্তার কারণ নাই, শর্বাণী তার দিদির কাছে থাকবে আজ, কাল বাড়ী যাবে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যান।

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে তার মেজদা চলে গেল।

দেবীপ্রসন্ন বাবু ও সুকোমল ভৌমিকের কাছে বিদায় নিয়ে শর্বাণীকে নিয়ে ওপরে চলে গেল ইন্দ্রাণী।

ঘরে গিয়ে শর্বাণী আবার বলল, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি দিদি, আমি কোন দোষ করিনি।

আচ্ছা সব শুনব পরে, ছেলেটা কে ?

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ছোট ছেলে দেবু। ওটা যে এতবড় শয়তান হয়েছে আমি কি জানতাম ? আমার এক পাটি জুতা ছিঁড়ে গিয়েছে ওকে মারতে মারতে। দেখছ না খালি পা ?

আর এক পাটির কি হল ?

থানায় একটা পুলিশকে ছুঁড়ে মেরেছি, হাসছিল আমার দিকে তাকিয়ে।

আচ্ছা, হাত মুখ ধুয়ে চান করে ভাত খেয়ে ঘুমো। রাতে ঘুমিয়েছিলি ?

কি করে ঘুম হবে দিদি, ঘরের চাবি যে পুলিশের হাতে ছিল। বসে থেকে মশার কামড় খেয়ে রাত কাটিয়েছি।

বাক্স খুলে কাপড় জামা বের করল শর্বাণীর জন্য। দু'জনে এক সঙ্গে গেল। বেরোবার সময় ইন্দ্রাণী বলল, দোর বন্ধ করে ঘুমো, ফিরতে চারটা হবে।

রাতে খাবার পরে শর্বাণীর কাহিনী শুনল ইন্দ্রাণী।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ছোট ছেলের দেবুর সঙ্গে সিনেমা দেখবে বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। সিনেমার টিকেট না পেয়ে তার সঙ্গে নৃসিংহগড়ে এসে কিছুক্ষণ তার সহপাঠিনী দেবুর ছোট বোনের সঙ্গে গল্প করে। বাড়ীতে বাবা ও পিসীর সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় ফেরবার জন্য বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। দেবু সঙ্গে ছিল। সে বার বার বলছিল কলকাতায় না ফিরে রাতে থেকে যেতে। শর্বাণী রাজি হয়নি মেজবৌদিকে বলে আসেনি বলে। বাস আসলে শর্বাণী উঠতে যাবে দেবু তার হাত চেপে ধরে নামিয়ে ফেলল। শর্বাণী তাকে চড় চাপড় মেরে, পায়ের জুতো খুলে মারতে লাগল। বাস থেকে লোক নেমে এসে খুব হৈচৈ করতে লাগল, কেউ কেউ দেবুকে চড়, ঘুষি মারল, তার নাক মুখ থেকে রক্ত পড়তে

লাগল। একজন পুলিশ বাসে যাচ্ছিল, নেমে এসে দু'জনকে থানায় নিয়ে গেল।

শর্বাণীর কাহিনী থেকে ইন্দ্রাণী আবিষ্কার করল দেবুর সঙ্গে তার প্রণয় চলছিল। দু'চারটে প্রশ্ন করে আরও জানতে পারল দু'বছর ধরে এই প্রণয় চলছে, দেবু তাকে বিয়ে করবে জানিয়েছিল। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ছবি দেখতে যাচ্ছে বলে মাঝে মাঝে দেবুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াত, ছবিও দেখত। একটা হাত ঘড়ি, দু'টো পেন দিয়েছে দেবু, দিদি দিয়েছে বলত বাড়ীতে।

দেবু শর্বাণীর দু' ক্লাস ওপরে পড়ত। দেখতে বেশ সুশ্রী ইন্দ্রাণী জানত। সে বুঝল হাত চেপে ধরে শর্বাণীকে বাস থেকে নামিয়ে ফেলবার পেছনে তার কোন দুরভিসন্ধি ছিল কিনা সন্দেহ। দু'বছর প্রণয় চালাবার পরেও শর্বাণীকে সে ঠিক চিনতে পারেনি মনে হয়।

সব রাগ ও বিরক্তি চলে গেল ইন্দ্রাণীর মন থেকে। ছোট বোনকে বলল, তুই ঠিক করেছিস, তোর কোন দোষ নাই। তারপর তাকে কাছে টেনে এনে চুমো খেল।

দিদি কড়া মানুষ শর্বাণী চিরকাল জানে, কোন দিন তাকে চুমো খায়নি। খুশী হয়ে দিদিকে জড়িয়ে ধরে দু'বার চুমো খেল।

পরদিন সকালে গাড়ী এল। দু'বোনকে নিয়ে গাড়ী ইন্দ্রাণীদের বাড়ীতে না গিয়ে ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকে গেল।

বারান্দায় উঠে দু'জনে দেখল দেবীপ্রসন্ন বাবু ও সুকোমল ভৌমিকের সামনে চেয়ারে বসে রয়েছে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, নাক, মুখ, কপাল ফোলা আসামী দেবু।

দেবুর খালি পা, খালি গা, গলায় চাদর।

১১

খ্যাতনামা বায়োকেমিষ্ট ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী প্রায় দু'বছর নৃসিংহগড়ে বাস করেও পল্লীর সমাজজীবন থেকে আলাদা রয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল একটা আকস্মিক দুর্যোগের ফলে। এভাবে পরিচয় না হলে কত দিনে পরিচয় হত বা হত কিনা বলা কঠিন।

তাঁর মেজদাদা দেবীপ্রসন্ন চক্রবর্তী মিশুক, মজলিশী মানুষ, উদ্যমশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। নৃসিংহগড়ে এসে বসবার দু'মাস যেতে না যেতে পল্লীর সমাজজীবনে তিনি আলোড়ন এনে দিলেন।

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাঁর মেজদার সম্বন্ধে আলাপের প্রসঙ্গে ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী বলেছিলেন কর্মজীবনের তিন ভাগের বেশী নয়া দিল্লীতে কাটালেও তার কৃত্রিমতার আবহাওয়া তাঁর বুদ্ধি, মন ও চরিত্রের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বলেছিলেন, মেজদা হচ্ছেন দি ষ্ট্রং ম্যান উইথ এ সফ্ট হার্ট। মানুষকে চালনা করতে জানেন তিনি, তাদের স্বমতে আনবার, তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার শক্তি আছে তাঁর।

প্রথম দিনেই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাঁর আলাপ অতি সহজে ঘনিষ্ঠতার কাছে পৌঁছেছিল। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কনিষ্ঠের বন্ধুত্বের প্রকৃতি খানিকটা অনুমান করে নিয়েছিলেন তিনি প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা থেকে। এই উচ্চশিক্ষিতা, সপ্রতিভা, স্বাধীনচেতা মেয়েটির সঙ্গে ভাল করে আলাপ করবার অপেক্ষায় রইলেন। আলাপ হল এবং তার ফলে তিনি যেমন ইন্দ্রাণীর আরও পরিচয় পেলেন ইন্দ্রাণীও তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের; চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেল।

শর্বাণীকে নিয়ে গোলযোগের পরে ইন্দ্রাণী রবিবারে, কোন কোন শনিবারেও আসত নৃসিংহগড়ে, নিজের প্রয়োজনে, দেবীপ্রসন্ন বাবুর অনুরোধে। সারাদিন তাঁর বাড়ীতে কাটাত, ঘণ্টা দু'য়ের জন্য বাড়ীতে যেত, সন্ধ্যার সময় কলকাতা ফিরত। অনেক রকমের আলাপ আলোচনা হত তাঁর সঙ্গে। এর মধ্যে তাঁর নিজস্ব ফিলোজফির ব্যাখ্যাও থাকত। এই সব টুকরো টুকরো ব্যাখ্যাকে একত্র জড় করলে এই রকম দাঁড়ায়।

ইণ্টেলেক্‌টের দিক দিয়ে বেশীর ভাগ স্ত্রী, পুরুষ আনডেভেলপড্। যতটা না ভাবলে নয় তার বাইরে যেতে অনিচ্ছুক তারা, তার বাইরের সব কিছুর জ্ঞান তারা বই থেকে বা লোকের মুখে শুনে সংগ্রহ করে এবং নির্বিচারে মেনে নেয়। একে বলা যায় বুদ্ধির ধারের কারবার। এই ধারের কারবারের ওপরে সমাজ চলছে।

কিছু লোক আছে যারা এই ধারের কারবার করে না। নিজেরা জানতে, বুঝতে, অনুভব করতে চায়, যা জানতে, বুঝতে, অনুভব করতে পারে সেই নূতন আইডিয়া, উপলব্ধি নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করে।

. লোক চালনা করবার স্বাভাবিক দক্ষতা এদের মধ্যে যাদের থাকে তাদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে লীডার।

বলতেন, পোলিটিকেল লীডার একটা আলাদা জাত, তাদের কথা বলব না, ইণ্টেলেক্‌চুয়েল লীডারের কথা কিছু শোন।

ইণ্টেলেক্‌চুয়েল লীডাররা সাধারণত 'ষ্টেটাস কো'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থাকে অপরিবর্তনীয় বা পবিত্র জিনিস, কাজেই হস্তক্ষেপের অযোগ্য বলে মনে করে না তারা, ইণ্টেলিজেণ্ট থট বা একশানের ফল বলেও মনে করে না।

পোলিটিক্‌সের ইডিওলজি এদের চোখে পার্টি গড়বার ফরমুলা মাত্র, মানুষকে তার শেকলে বেঁধে পার্টির প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য

নির্দিষ্ট খোঁয়াড়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার ফরমুলা। বলতেন, মোষের গাড়ীতে চড়েছ কখনও ? ছোট লাঠি হাতে নিয়ে ছইয়ের সামনে বসে গাড়োয়ান ঝিমোয়, মাঝে মাঝে বলে "হেট হেট, ডাঁয় ডাঁয়, বাঁয় বাঁয়।" সূক্ষ্মাকারে ইডিওলজি পারে এর মধ্যে।

ইন্টেলেকচুয়েল লীডার সাহসী পুরুষ। পুরনো ব্যবস্থাকে ঢেলে নূতন করে সাজাবার সাহস আছে তার। সে জানে যে মানুষের দেবতা বা দানব হওয়াটা ব্যতিক্রম, বেশীর ভাগ মানুষ কিছুটা ভাল, কিছুটা মন্দ, আধকানা, ঢিলেঢালা প্রকৃতির। তাই থাকতে চায় তারা। ইষ্টের পথে এদের চালিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি ও উদ্যম যাদের আছে তাদের বলা যায় ষ্ট্রংম্যান।

ষ্ট্রংম্যানশিপের উৎপত্তির একটা ডাইলিউটেড, ফিলটার্ড ব্যাখ্যা পেল সে ইন্দ্রাণী মনে করল।

বলতেন, ষ্ট্রংম্যানের আবির্ভাব অনেক প্রাচীন কালের ব্যাপার। মানুষ, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ সবাই গোড়া থেকে বিলিভার্স ইন দি কাল্ট অব দি ষ্ট্রংম্যান। ভায়া বলতে পারবেন জেনেটিক কোডের মধ্যে এটা মিলবে কি না।

ইন্দ্রাণী হেসে ফেলে দেবীপ্রসন্ন বাবুর কথা শুনে।

হাসলেও ক'টা ব্যাপার থেকে ইন্দ্রাণী বুঝে নিয়েছে দেবীপ্রসন্ন বাবু একজন ষ্ট্রংম্যান। তাঁর উচ্চ কণ্ঠের হাসি, অজস্র কথা, পরিহাস, রসিকতা, মেয়েলী কোমলতা, প্রচুর স্নেহের ফুল পাতার আড়ালে ঢাকা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে জ্বলতে দেখা যায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আগুন।

এ আগুন আব কারো চোখে পড়েছে কি না ইন্দ্রাণী জানে না, তার চোখে তো পড়েছে।

শর্বাণীর গোলযোগের নিজের পছন্দমত একটা মীমাংসা করবেন স্থির করেছেন দেবীপ্রসন্ন বাবু, ইন্দ্রাণী বুঝতে পারল।

শর্বাণী মাঝে মাঝে আসে তাঁর বাড়ীতে এবং সেদিন ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ছোট ছেলে দেবুকেও তাঁর বাড়ীতে দেখা যায়।

দু'জনকেই তিনি বসতে বলেন, চা খাবার খেতে দেন, পিঠ থাবড়ে, মাথা চুলকে দেন।

দেবুর সব ক্ষত ভাল হয়েছে, শুধু হাতে শর্বাণীর কামড়ের চিহ্নটি রয়ে গিয়েছে। ফর্শা রঙের ওপরে একটা তামাটে দাগ। কামড়ের দাগ বলে বোঝা যায় না, তবে শর্বাণী স্বীকার করেছে সে কামড়ে দিয়েছিল হাত ছাড়াবার জন্য।

সুকোমল ভৌমিক জানিয়েছে দেবুর দুই দাদা দেবীপ্রসন্ন.বাবুর প্রস্তাবে রাজি হয়েছে তবে নৃসিংহদেবের সেবাইত পদ যাতে তিন ভায়ের থাকে এটা করতে হবে, ট্রাষ্টী বোর্ডের উপদেশ তারা মেনে চলবে।

দলিল লেখা ও রেজেষ্টারী হয়ে গেল, ট্রাষ্টী বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হলেন দেবীপ্রসন্ন বাবু।

শর্বাণী ও দেবুর বিয়ের দিন ঠিক হল।

কলেজের বাড়ী হয়ে এল প্রায়। গভর্ণিং বডির দু'তিনটে সভা হয়েছে। গভর্ণিং বডির প্রেসিডেণ্ট দেবীপ্রসন্ন বাবু, সেক্রেটারী সুকোমল ভৌমিক, মেম্বার ডাঃ এন. পি. চ্যাটার্জি, ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী, ডাঃ ইন্দ্রাণী সান্যাল।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর প্রস্তাবে মেয়েদের স্কুলবাড়ীতে ছেলেদের জন্য স্কুল খোলা হবে ঠিক হয়েছে, মেয়েদের স্কুল কলেজ বাড়ীতে উঠে আসবে।

পল্লীর লাইব্রেরী, ড্রামাটিক ক্লাব, ডিফেন্স পার্টিতে হাত পড়েছে, রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তীর বাড়ীকে পল্লীর লোক দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ী বলে আজকাল।

ইন্দ্রাণী পল্লীর মেয়ে কিন্তু পল্লীর লোকের সঙ্গে বড় মিশত না। তাদের বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে, অসম্ভব খেটে এগোতে হয়েছিল তাকে, পল্লীর লোকের কাছে সহানুভূতি বা সাহায্য বিশেষ পায়নি। বাপের ওপরে আকর্ষণ

ছিল, বোনদের ওপরে ছিল, বাড়ীর সঙ্গে, পল্লীর সঙ্গে, এইটে ছিল সংযোগের সূত্র। কলেজের ব্যাপার নিয়ে এবং আরও অনেক রকমে তাকে পল্লীর সমাজের সঙ্গে মিশতে বাধ্য করলেন দেবী-প্রসন্ন বাবু। দেখল সবাই জেনে গিয়েছে সে নূতন কলেজের প্রিন্সিপাল হবে। পল্লীর মেয়ে এত বড় পণ্ডিত হয়েছে, এত বড় সম্মানের পদে বসছে, নূতন করে সবাই যেন তাকে চিনতে পারল এবং উপযুক্ত মর্যাদা দিতে অগ্রসর হল। ইন্দ্রাণী ভাবল একটা নূতন অভিজ্ঞতা বটে।

দেবীপ্রসন্ন বাবু একদিন প্রশ্ন করলেন, তুমি সত্যি তোমার কলেজ ছেড়ে নূতন কলেজে আসতে রাজি আছ তো? কিছু ঝামেলা পোয়াতে হবে, বাড়তি খাটুনি হবে কলেজ চালু করতে। তোমার মুখ দেখে আমার মনে একটু খটকা লাগছে।

হাসল ইন্দ্রাণী, আপনার চোখ এড়ানো শক্ত। এখানে আসবার খুব বেশী ইচ্ছা যে আছে তা নয়। আমি পড়াশোনা করতে ভালবাসি, দু'চারখানা বই লেখবার ইচ্ছা আছে, বেশী হাঁকডাক পছন্দ করি না।

অর্থাৎ যেমন আমি করি? হেসে দেবীপ্রসন্ন বাবু বললেন।

তা নয়। আপনি কাজের মানুষ, আমি শুধু পড়ুয়া মানুষ।

একটা কথা জিজ্ঞেস করি, রাগ করো না। পড়াশোনা করতে চাও, বই লিখতে চাও ইত্যাদি শুনলাম। বয়স হচ্ছে, সংসার করবার ইচ্ছা হয় না মনে?

হেসে ইন্দ্রাণী বলল, যাদের ইচ্ছা হয় তারা ব্যবস্থা করে নেয় চটপট, যেমন আমার দুই বোন করেছে। এ রকমের ইচ্ছা করবার সময় কোথায় আমার? মাস পাঁচ ছয় আগে পর্যন্ত দু'টো টিউশানি, কোচিং ক্লাস করেছি কলেজের কাজ চালিয়ে, সংসারের কাজও কিছু দেখতে হত।

দেবীপ্রসন্ন বাবু উঠে পায়চারি করতে লাগলেন, তারপর ইন্দ্রাণীর চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, তোমার ইতিহাস

আমি শুনেছি ইন্দ্রাণী, ইউ হেভ স্ট্রাগলড্ ব্রেভলি, ইউ আর এ ব্রেভ, গুড গার্ল।

তার পর ঘুরে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে স্বর নামিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে অনেক শক্তি আছে, এ লড়াইতে তোমার কোন লোকসান হয়নি, তুমি জয়ী হয়েছ। ভেতরে, বাইরে এ লড়াই কোন দাগ কেটে দিয়ে যায়নি। আই সি বিফোর মি এ লাভলি, ব্রেভ, গুড গার্ল, অনেষ্ট সিনসিয়ার।

ইন্দ্রাণী মুখ নামাল।

তোমাকে মুখ নামাতে হবে না মা এ বুড়োর সামনে। তুমি সুখী হও, তোমার জীবন আনন্দে পূর্ণ হোক সর্বান্তঃকরণে চাই আমি। ইউ ডিজার্ভ অল হেপিনেস হ্যাট লাইফ ক্যান গিভ।

তারপর রসিকতা করলেন, এতগুলো ভাল ভাল কথায় স্তব স্তুতি করলাম, প্রসন্ন হয়ে একটু হাসতে হয় বাছা।

মুখ নামিয়ে হেসে ফেলল ইন্দ্রাণী।

১২

শর্বাণীর বিয়ে হয়ে গেল।

বাসন্টপে হাত ধরাতে যাকে মেরে ধরে টিট করে দিয়েছিল তাকে বিয়ে করতে কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করল না সে। আর যে মেয়ের হাতে জুতোপেটা খেয়েছিল তাকে বিয়ে করতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ছোট ছেলে দেবু কোন রকম ভয় প্রকাশ করল না। বাসরে বৌকে চিমটি কেটে সে মারের শোধ নিয়েছিল মেয়ে মহলের গুজব।

শর্বাণী দেখতে ভাল। দিদির দেয়া শাড়ি, জামা, গয়নায় সেজে বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। শোনা যায় দেবুর বন্ধুরা আড়ালে তাকে

বলেছিল, তোর বৌ ভাগ্য ভাল, একটু মার না হয় খেয়েছিলি, কি হয়েছে তাতে ?

ইন্দ্রাণীর ভগ্নীর দায় মিটে গেল, থাকল শুধু বুড়ো বাপের দায়।

বিয়ের গোলমাল মিটে যাবার পরে নিজের কথা একটু একটু ভাবতে লাগল। নিজের কথা মানে নৃসিংহগড়ে নূতন কলেজে তার যাওয়া ভাল, না যে কলেজে কাজ করছে সেখানে থেকে যাবে ? মনে হয় এখানে থেকে যাওয়া ঠিক হবে তার পক্ষে।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর কাছে একটা খবর পেয়েছিল। ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী তাঁর মেজদাকে চিঠিতে জানিয়েছেন তাঁর এবারকার কাজ শেষ হয়েছে। মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের কেম্বি জের লেবরে-টরীতে তিন বছর কাজ করবার জন্য একটা অফার পেয়েছেন। এই কাজ নিলে ছ'মাস পরে কাজে যোগ দিতে হবে। ভাবছেন দেশে না ফিরে এই সময়টা এখানে কাটাবেন। উত্তরে দেবীপ্রসন্ন বাবু তাঁকে আপাততঃ দেশে ফিরতে অনুরোধ করেছেন।

শর্বাণীর বিয়ের দশ দিন পরে তিনি ফিরলেন।

সেদিন নৃসিংহগড়ে ছিল ইন্দ্রাণী। ডাঃ চক্রবর্তীর ফেরবার কথা সেদিন সে জানত না। দেবীপ্রসন্ন বাবু কিছু বলেননি আগে, সকালে দেখা করতে গেলে কথাবার্তার মধ্যেও কিছু বললেন না।

কথাবার্তা শেষ করে সে যখন উঠছে সেই সময় একখানা গাড়ী বাড়ীতে ঢুকল, গাড়ী থেকে নামলেন ডাঃ চক্রবর্তী।

লম্বা পা ফেলে বারান্দায় উঠে এসে মেজদাকে প্রণাম করলেন, তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মেজদা।

ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাল আছ ?

ভাল আছি।

এগিয়ে এসে প্রণাম করল, বলল, আপনাকে তেমন ভাল দেখাচ্ছে না।

ভালই আছি আমি।

দুই ভ্রাতার মধ্যে আলাপ চলল, ইন্দ্রাণী চুপ করে বসে নানা কথা ভাবতে লাগল। কোন মানে হয় না সে সব কথার, অথবা হলে ইন্দ্রাণী বলতে পারে না কি মানে হয়। ডাঃ চক্রবর্তী গম্ভীর মানুষ, আরও গম্ভীর হয়েছেন। দু'টো কথা হল ইন্দ্রাণীর সঙ্গে, দু'টোই মামুলী। তেমন ভাল দেখাচ্ছে না বলে অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রাণী যে উদ্বেগ প্রকাশ করতে চেয়েছিল, যে ঘনিষ্ঠ আলাপের সূত্রপাত করতে চেয়েছিল কোন রিএকশন দেখা গেল না তার। 'ভালই আছি আমি' বলে সব সম্ভাবনা শেষ করে দিলেন। সে প্রণাম করল দেবী প্রসন্ন বাবুর সামনে, তার কোন বিশেষ অর্থ থাকা সম্ভব, একটু হেসে বা আর দু'টো ফালতু কথা বলে প্রতিদান দেয়া উচিত এ রকম একটু ভাবও প্রকাশ করলেন না। ভেতরে অনেকটা উদাসীনতা জমা না হলে এ রকম হয় না।

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী, আচ্ছা, আজ আসি।

ডাঃ চক্রবর্তীও উঠলেন, ফটক পর্যন্ত তার সঙ্গে গেলেন, বললেন, দু' একটা জিনিস এনেছি ফ্রান্স থেকে তোমার জন্য, সময় পেলে এসো আরেক দিন। তোমার ছোট বোনের বিয়ে হয়ে গেল মেজদার চিঠিতে জানলাম। তোমাকে দেনা করতে হয়েছে কি?

ইন্দ্রাণী তাকাল তাঁর দিকে, বলল, না, আমি যে টাকা জমিয়েছিলাম শর্বাণীর বিয়ের জন্য তার মধ্যে হয়ে গিয়েছে। বরপক্ষের কোন দাবি ছিল না।

হেসে বললেন, বোনেদের জন্য তোমার দুর্ভাবনার শেষ হল তা হলে?

ইন্দ্রাণীও হাসল, হ্যাঁ।

তুমি কি এখানকার কলেজে আসছ?

বলতে পারছি না এখন।

ডাঃ চ্যাটার্জিরা সবাই ভাল আছেন?

ভাল আছেন।

আচ্ছা, এবার এসো।

ইন্দ্রাণী হাঁটতে লাগল ভাবতে ভাবতে। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে এ আলাপ করবার মানে কি? দেবীপ্রসন্ন বাবুর সামনে এ আলাপ কি হতে পারত না?

ডাঃ চক্রবর্তী বলেছিলেন সময় করতে পারলে যেতে। সময় হল না। পরের রবিবারে হষ্টেলের মেয়েদের নিমন্ত্রণে তাদের সঙ্গে ছবি দেখতে গেল। তার পরের রবিবারে গেল মেসোমশায়ের বাড়ীতে। মাসীমা খেতে বলেছিলেন। খাবার জন্য নয়, নিউ হিষ্ট্রী স্কুলের পরের সংখ্যা যে বুলেটিন তৈরী করবার ভার পেয়েছিল সে, মেসোমশায়ের সঙ্গে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য গেল।

আলোচনা শেষ হবার আগে মাসীমা ডেকে পাঠালেন। সে উঠছিল মেসোমশাই তাকে উঠতে নিষেধ করে নিজে ভেতরে গেলেন এবং মিনিট দশ পরে ফিরে এলেন। বললেন, তোমার মাসীমার কি কথা ছিল ও বেলা বলবেন। এসো, আমাদের কাজ শেষ করি।

কাজের কথা শেষ হয়ে গেলে আরও এক ঘণ্টার বেশী সময়, স্নান করতে না ওঠা পর্যন্ত, তিনি আটকে রাখলেন ইন্দ্রাণীকে। নূতন কলেজের কথা, সুশোভন, সুবিমল, অনিমেষ ও দীপঙ্করের কাজের কথা হল। ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী পরশু দেখা করতে এসেছিলেন এবং মেডিকেল কাউন্সিলের কেম্ব্রিজের লেবরেটরীতে চাকুরির কথা বললেন এ খবরও তিনি জানালেন। বললেন, ভদ্রলোক এত টাকা খরচ করে লেবরেটরী গড়েছেন কিন্তু স্থির হয়ে বসে কাজ করতে পারছেন না, দু'বার বাইরে ঘুরে এলেন, আবার যাচ্ছেন। এদেশে বায়োকেমিষ্ট্রির কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ইন্দ্রাণীর মনে হল এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার ভূমিকা হিসাবে কথাগুলো বললেন মেসোমশাই। কিন্তু আর কিছু বললেন না ডাঃ চ্যাটার্জি, শুধু জানালেন দেবীপ্রসন্ন বাবু কাল এসেছিলেন।

তার কি সম্পর্ক আছে এ সব দেখা সাক্ষাতের সঙ্গে ইন্দ্রাণী বুঝতে পারছিল না, চুপ করে ভাবছিল। ডাঃ চ্যাটার্জি সিগারেক্ক

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বার দুই তাকালেন ছাত্রীর গম্ভীর মুখের দিকে।

মাসীমা কি বলবেন তাকে তাঁর মুখ দেখে অনুমান করতে পারল না ইন্দ্রাণী। গল্প গুজবের মধ্যে খাওয়া শেষ হল। তারপর ঘণ্টা তিনেক সময় মেসোমশায়ের ঘরে বই ঘেঁটে ঘেঁটে কাটিয়ে দিল ইন্দ্রাণী। রবিবারেও দিনে ঘুমোবার অভ্যাস নাই তার।

চা খাবার আগে শুনল মাসীমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছেন।

অপুরা কিছু খেয়ে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসল, তারা তিনজন তখনও চায়ের টেবিলে। মাসীমা জামা কাপড় বদলে তৈরী হয়ে চায়ের টেবিলে বসেছিলেন। হঠাৎ কি মনে করে অপুকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোরা যা, শীগ্‌গির ফিরবি, আমি যেতে পারলাম না দিদিমাকে বলবি।

অপুরা চলে গেল।

চায়ের কাপ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অতর্কিতে তোপ দাগতে শুরু করলেন মাসীমা, হাঁরে ইন্দ্রাণী, কি ভেবেছিস তুই, বলত আমাকে খুলে—

পনের মিনিট ধরে অবিরাম গোলা বর্ষণ করে ক্লান্ত হয়ে থামলেন।

বেচারা ইন্দ্রাণী! এতটা সময়ের মধ্যে মুখ খোলবার অবসর পেল না। ভরসাও পেল না। শুধু হতচকিত, করুণ দৃষ্টিতে কয়েকবার মেসোমশায়ের দিকে তাকিয়েছিল সে। মেসোমশাই নীরবে সিগারের ধোঁয়া ছাড়ছিলেন, ইচ্ছা করে হোক বা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষতা বিজ্ঞজনসম্মত-নীতি মনে করে হোক, প্রিয় প্রাক্তন ছাত্রীর সমর্থনে ধোঁয়ার ফাঁকে একটি কথাও ছাড়লেন না।

ইন্দ্রাণী মাথা নামিয়ে বসেছিল, নইলে তার বুঝতে দেরি হত না ছদ্ম ও প্রকাশ্য দু' রকমের আততায়ীর পাল্লায় পড়েছে সে, কারণ

ত্রিশ সেকেণ্ডের জন্য সিগার মুখ থেকে হাতে ধরে মেসোমশাই যে দৃষ্টি প্রেরণ করেছিলেন স্ত্রীর দিকে তার মধ্যে অনুমোদনের হাসি চিকচিক করেছিল।

ক্লান্তি অপনীত হলে ইন্দ্রাণীর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে স্থর বদলে ফেললেন মাসীমা। বললেন. তোর ব্যবহারকে বলা যায় এসাসিনেশন অব টেলেণ্ট। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে একটু মায়া হয় না তোর? মন দিয়ে নিজের কাজ করতে পারছেন না, ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন, কেন তুই কি বুঝিস না বলতে চাস?

একটু থেমে বললেন, পরে তোরও ঐ দশা হবে, কিছু ভাল লাগবে না সংসারে। নিজের ঘর গেরোস্তি পেয়ে স্থিতি হল না যে মেয়ের তার সব বৃথা হয়ে যায়।

ইন্দ্রাণী বসে রইল চুপ করে। তার যা বলবার ছিল তা বলবার সুযোগ পেল না সে, আর সুযোগ পেলেও মেসোমশায়ের উপস্থিতিতে তা বলতে পারত না।

নীরবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর উঠে দাঁড়াল. বলল, আজ যাই মাসীমা।

এতক্ষণ পরে মেসোমশাই কথা বললেন, ব'সো একটু, গাড়ী বার করতে বলছি। পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ইন্দ্রাণী কি বলতে যাচ্ছিল, মাসীমা ধমকালেন, অবাধ্য হোস না, বোস।

গাড়ীতে ওঠবার আগে মাসীমা আদর করে ইন্দ্রাণীর মাথা বুকের ওপরে টেনে নিলেন, মৃদুকণ্ঠে বললেন, তোর মন না বুঝলে একটা কথাও বলতাম না আমি। ভগবান জানেন কোথায় আটকাচ্ছে তোর।

ইন্দ্রাণী চুপ করে রইল।

হস্টেলে ফিরতে দারোয়ান একখানা চিঠি দিল তার হাতে।

নিজের ঘরে গিয়ে চিঠি খুলল। দেবীপ্রসন্ন বাবুর চিঠি। লিখেছেন, পরশু মঙ্গলবার ছুটি আছে, বিকেলের দিকে যদি

কিছুক্ষণের জন্য আসতে পারো ভাল হয়। কলেজ সম্বন্ধে কিছু জরুরী কথা আছে। তোমাকে ধরতে পারব ভেবে নিজে এসেছিলাম, তুমি বেরিয়ে গিয়েছ শুনে চিঠি রেখে গেলাম।

মন ভাল ছিল না, শরীরও ভাল লাগছিল না। সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ারে বসে রইল, নানা রকমের কথা মাথায় আসছিল, যাচ্ছিল। রাত বারোটা বাজে দেখে শুতে গেল।

অনেকক্ষণ পরে খানিকটা তন্দ্রার মত ভাব এল। তন্দ্রার ঘোরে মনে হল একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে, কাছেই কোথাও যেন একটা কিছু ভেঙ্গে পড়ছে গলে গলে, ঝুর ঝুর শব্দ করে। হঠাৎ মাসীমার পনের মিনিট ধরে এক নাগাড়ে বকুনির কথা মনে এল কি করে। তার কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রার ঘোর কেটে গিয়ে জেগে উঠল ইন্দ্রাণী, দেখল সে কাঁদছিল, জল গড়িয়ে পড়ে বালিশের পাশটা ভিজে গিয়েছে। উঠে বসে চোখ মুছল আঁচল তুলে। কান্না পাবার অবস্থায় পড়েও যে কাঁদতে লজ্জা পায় এমনি করে তাকে কাঁদতে হয় নাকি ?

মঙ্গলবার বিকেলের দিকে নৃসিংহগড়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল ইন্দ্রাণী, বাড়ী গিয়ে বাবাকে দেখে ফেরবার পথে দেবীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে দেখা করবে মনে করে। পাঁচটা বাজবার কিছু আগে দেবীপ্রসন্ন বাবুর ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে উপস্থিত হল।

ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ীতে গাড়ী ঢোকবার মুখে দেখল শর্বাণী ও তার স্বামী বেরিয়ে আসছে বাড়ী থেকে।

গাড়ী থেকে নেমে পড়ল ইন্দ্রাণী, ড্রাইভারকে বলল, বাবুকে বলো একটু পরে যাচ্ছি আমি।

ম্যাটিনী শো দেখে বাড়ী ফিরছিল শর্বাণীরা, তাদের দেখতে পেয়ে দেবীপ্রসন্ন বাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন। চা খেয়ে বাড়ী ফিরছিল তারা।

শর্বাণী দিদিকে রাতে খাবার নিমন্ত্রণ করল, বলল, রাত হবে, হস্টেলে না ফিরলে যদি চলে তা হলে সুকোমল বাবুর বাড়ী থেকে

ফোন করে জানিয়ে .দেব। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না সহজে, আজ থাকো না দিদি।

তারপর স্বামীকে ধমকাল, তুমি কিছু বলছ না কেন ?

দেবু বলল, আজ থাকুন দিদি। যদি যেতে হয় আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

বেশ লাগল ইন্দ্রাণীর ওদের হু'টিকে দেখে। হেসে বলল, যাবার পথে একটা ফোন করে দিস মনিটরকে ডেকে আজ যেতে পারব না।

এখানে বেশী দেরি করো না দিদি, শর্বাণী বলল, আমরা যাচ্ছি।

তারা হাঁটতে শুরু করলে ইন্দ্রাণী ডাঃ চক্রবর্তীর বাড়ীতে ঢুকল।

কোথা থেকে শাদা কুকুরটা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ে, লেজ নাড়তে লাগল, তার হাঁটুতে মাথা ঘষতে লাগল। হেঁট হয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল ইন্দ্রাণী আর বুঝতে পারল কুকুরটা তাকে অভ্যর্থনা করল দেখে ভাল লাগল তার।

দেবীপ্রসন্ন বাবু বারান্দায় বসে রেডিও শুনছিলেন, রেডিও বন্ধ করে বললেন, এসো।

তারপর বললেন, রাতে ফিরে যেতে হবে, না, বাড়ীতে থাকবে ?

ফিরে যাব ভেবেছিলাম, শর্বাণী রাতে খাবার কথা বলল। কলেজের কথা কি বলবেন ?

বলব, বলব, এত তাড়া কিসের ? কেমন লাগল ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে দেখে ?

শর্বাণী দেখতে আরও ভাল হয়েছে মনে হল।

হু'জনে একসঙ্গে কলেজে যায়, একসঙ্গে ফেরে, ফেরবার সময় চোখে পড়লে ওদের ডেকে একটু বসাই, চা খাওয়াই, বেশ লাগে ওদের আলাপ শুনতে। ছোকরাটি শর্বাণীর বুড়ো আঙ্গুলের নীচে স্থান পেয়েছে।

বুঝতে না পেরে তাকাল ইন্দ্রাণী। বললেন, হি ইজ কমপ্লিটলি আণ্ডার হার থাম্ব। বুঝলে এবার ? প্রেয়সীর দাঁতের কামড়

আর পায়ের জুতো পেটা খেয়ে ছোঁড়াটা মারভেলাসলি ইমপ্রুভ করেছে। বি. এস. সি. পরীক্ষা দেবে এবার, এম এস. সি. পড়বে বলছিল। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছে।

আরও চার পাঁচ মিনিট এই সব কথা চলল। কথার মাঝখানে দেবীপ্রসন্ন বাবু উঠে পায়চারি করতে লাগলেন, তারপর ইন্দ্রাণীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, আমি যা বলছি শুনে রেগে যেয়ো না, তোমার মুখের চেহারা কি রকম লাগছে।

সুপ্রসন্ন এই বাইরে থেকে ঘুরে এল, আবার যাচ্ছে তিন বছরের জন্য।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি ওর বাজনা শুনেছ, ওর আঁকা ছবি দেখেছ ?

জোর ধাক্কা দিয়ে অনেকগুলো কথা মুখ থেকে একসঙ্গে বেরোবার জন্য ঠেলাঠেলি করতে লাগল, মাথা নামিয়ে ইন্দ্রাণী শুধু বলল, হ্যাঁ।

আশ্চর্য প্রতিভা ওর। শুধু বাজনায়, শুধু ছবি আঁকায় লেগে থাকলে নাম হত ওর। বিজ্ঞানে হাত দিয়েছে, দেশ বিদেশে নাম হয়েছে, নানা জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ আসছে লেকচার দেবার। শক্তি দিয়েছেন ওকে ভগবান, আবার কপালে লিখে দিয়েছেন তুমি সুখী হতে পারবে না জীবনে। একটি ভালো মেয়ের ভালবাসা পেয়ে সুখী হতে চেয়েছিল, তাকে কেড়ে নিলেন ভগবান—

অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না ইন্দ্রাণী। বিস্ফোরণের অনিবার্য মুহূর্ত এসে পড়েছিল বোধ হয়। এক টানে বলে চলল, সংসারের দিক দিয়ে কিছু অসুবিধা হয়ত ঘটেছে, কিন্তু তাঁকে অসুখী বলছেন কেন ? যাঁকে ভালবেসেছিলেন তাঁর স্মৃতি মনে রেখে তিনি সুখী হয়েছেন। তাঁর স্মৃতির অপমান হয় এমন কোন কাজ করতে পারেন না তিনি। তাতে তাঁর অসুখী হবার সম্ভাবনাই তো বেশী। সাধারণ মানুষ হলে অন্য রকম হতে পারত, তিনি যে অসাধারণ মানুষ, বিজ্ঞানী, জ্ঞানী, গুণী, মহৎ—

কথা শেষ না করে থেমে গেল ইন্দ্রাণী।

এত বড় লম্বা বক্তৃতা শুনে দেবীপ্রসন্ন বাবু তাকালেন তার দিকে। কথাগুলো সে আগে থেকে তৈরী করে রেখেছে তাঁর মনে হল। দেখলেন একটু যেন হাঁফাচ্ছে।

বললেন, ব'সো, পালিয়ে যেয়ো না।

ভেতরে গিয়ে কিছু খাবার ও কফির কথা বলে এলেন, খবর নিলেন ভ্রাতা লেবরেটরীতে।

ফিরে এলেন।

চেয়ারে না বসে ইন্দ্রাণীর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন, তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি বড় বোকা মেয়ে ইন্দ্রাণী, পণ্ডিত বোকা।

চমকে উঠল ইন্দ্রাণী, মাসীমার কথাগুলো বলছেন দেবীপ্রসন্ন বাবু।

বললেন, বই পড়ে পড়ে পণ্ডিতী ফরমুলার মধ্যে আটকে গিয়েছ তুমি, তোমার মনের ভাঁজগুলো ইস্ত্রি করে পালিশ করা আবশ্যক।

কফি, খাবার এল।

বললেন, খাও।

কিছুক্ষণ পরে ডাকলেন, ইন্দ্রাণী!

কফির পেয়ালা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে দেখছিল ইন্দ্রাণী। মাথা না তুলে বলল, বলুন।

দেবীপ্রসন্ন বাবুর হাত তার কাঁধের ওপরে নেমে এল, বললেন, সুপ্রসন্নর বাইরে যাবার প্ল্যানটা ভেস্তে দিতে পারো যদি, নিজের মেয়েদের চাইতে বেশী ভালবাসব তোমাকে।

লাল কাল ছায়া খেলে গেল ইন্দ্রাণীর মুখে, জিভের জড়তা দেখা দিল, আমি, আমি, কি বলছেন—

চোপ, গর্জন করে উঠলেন দেবীপ্রসন্ন বাবু, ডোণ্ট টক লাইক এ ফুল।

ইন্দ্রাণী অপমানিত বোধ করবার মত জোর মনে খুঁজে পেল না বোধ হয়, চুপ করে কফি খেতে লাগল।

স্বর আশ্চর্য কোমল হয়ে গেল, কাঁধ থেকে নেমে হাত পিঠের ওপরে বেড়াতে লাগল, দেবীপ্রসন্ন বাবু বললেন, আমি সুপ্রসন্নর বাইশ বছরের বড় মেজদা। সারা জীবন নানা জাতের লোক চরিয়ে এসেছি। আমি যেখানে বলছি তুমি পারো, সেখানে কিন্তু স্যর, আমি কি করে স্যর করবার বোকা ট্যাকটিক্‌স চালিয়ো না। ভেবেছ তোমার মন বুঝি না আমি? কত তোমার বয়েস, কি তোমার অভিজ্ঞতা যে আমার কথার ওপরে কথা বলবার সাহস হল? যে মেয়েকে ভালবেসেছিল সুপ্রসন্ন তার স্মৃতির পূজো সে এখনও করছে। কিন্তু সে এখন আকাশের দেবীর স্তরে। জীবনকে সচল রাখতে হলে স্বর্গের দেবীর পূজো যথেষ্ট নয় মেয়ে, একটি মর্ত্যের দেবীকে হাত লাগাতে হয়। এ কথা যে ষ্টুপিড মেয়ে বুঝতে চায় না শিভ্যালরি ভুলে গিয়ে তাকে থাবড়ে দিতে ইচ্ছা করে।

এত গাল খেয়েও রেগে গিয়ে উঠে পড়ল না ইন্দ্রাণী, মাথা নামিয়ে চুপ করে একটা সিঙ্গাড়া ভেঙ্গে মুখে দিল।

ঘুরে সামনে এসে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন দেবীপ্রসন্ন বাবু, হাসি উঁকি দিল মুখে, দৃষ্টিতে স্নেহ গলে পড়ছিল। টেবিলের ওপরের ভাসের রজনীগন্ধার ডাঁটা থেকে ক'টা ফুল ছিঁড়ে ইন্দ্রাণীর চুলে পরিয়ে দিলেন, বললেন, কি অবিচার যে করেছেন ভগবান বড় বড়, শক্ত শক্ত পুরুষ মানুষদের ছোট্ট ছোট্ট, বোকা বোকা মেয়েদের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে! শাস্তির একশেষ হচ্ছে তাদের।

চেয়ারে এসে বসলেন, বললেন, নিজে দেখতে পাচ্ছ না তুমি, দু'টো ফুল চুলে পরে ডাঃ ইন্দ্রাণী সান্যালের মাষ্টারনী রূপ যবনিকার অন্তরালে পলায়িত। যে রূপ খুলেছে,—আচ্ছা, আচ্ছা, আর কিছু বলব না, খাবারগুলো শেষ করো।

ইন্দ্রাণীর খাওয়া শেষ হয়েছে ভৃত্য ট্রেতে করে দু'কাপ কফি, দু' ডিশ খাবার নামিয়ে রাখল।

দেবীপ্রসন্ন বাবু বললেন, সাহেবকে ডেকে দাও, বলো কফি দেয়া হয়েছে বারান্দায়।

একটু পরে ডাঃ চক্রবর্তী আসলেন।

চকিত দৃষ্টিতে ইন্দ্রাণী তাকাল তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভাল আছেন?

হ্যাঁ, ভাল আছি। তুমি ভালো আছো?

তারপর বললেন, তোমার সব গোলযোগ মিটেছে তো?

দেবীপ্রসন্ন বাবু বললেন, একটুর জন্য আটকে আছে।

সভয়ে তাঁর দিকে চাইল ইন্দ্রাণী। ওখানে আর থাকবার সাহস হল না আরও কি বলবেন ভয়ে। বলল, আমি আসছি।

ভেতরে চলে গেল।

চেয়ারে বসে কফির পেয়ালা টেনে নিলেন ডাঃ চক্রবর্তী, মেজদার দিকে চেয়ে বললেন, কি হয়েছে ইন্দ্রাণীর, মুখ কেমন ভার ভার দেখলাম।

নিজের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মেজদা বললেন, বকেছি আমি। বোধ হয় আড়ালে গেল একটু কেঁদে নেবে বলে। স্বচ্ছন্দে এখানে বসে কাঁদতে পারত, একটু আহা উহু করতে পারতাম। আড়াল না হলে মেয়েরা কিছুই করতে পারে না।

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল ডাঃ চক্রবর্তীর মুখে, কিছু বললেন না।

দেবীপ্রসন্ন বাবু বললেন, ইন্দ্রাণী আসবার আগে তার ছোট বোন শর্বাণী স্বামীটিকে নিয়ে এসেছিল কিছুক্ষণের জন্য। ভারি কাজের মেয়ে শর্বাণী। জুতোপেটা করে খোকাটিকে ঢিট করে দিয়েছে, প্রিয়তমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন। বশ করবার এই কায়দাটা সত্য যুগে পুরুষদের ব্যবহার্য ছিল, কিন্তু কলিযুগে হাত-ফের হয়েছে দেখা যাচ্ছে। নূতন যুগধর্মের অন্যতম প্রবর্তকের মর্যাদা পাওয়া উচিত শর্বাণীর।

নীরবে খাবার ও কফি খাওয়া শেষ হল ডাঃ চক্রবর্তীর।

দেবীপ্রসন্ন বাবু কনিষ্ঠের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি বাইরে যাবার আগে একটা চা পার্টি দেব মনে করেছি। চ্যাটার্জিদের বলব শুধু। ওদের সেই সুন্দর দেখতে মেয়েটা নাচবে।

আচ্ছা, আমি বলে আসব যেদিন বলতে চাও।

খানিকটা সময় চুপচাপ কাটল। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছিল।

দেবীপ্রসন্ন বাবু বললেন, মেয়েটা গেল কোথায়? বাড়ী যাবে না নাকি?

উঠলেন ডাঃ চক্রবর্তী, আমি দেখছি।

পরে যেতে চাইলে আলো দিয়ে দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিলেও চলবে, তাড়া দিয়ো না।

আচ্ছা।

ডাঃ চক্রবর্তী চলে গেলেন। যদি মেজদার দিকে একবার তাকাতেন যাবার আগে হয়ত তখনই চলে যেতে পারতেন না, হয়ত একটু দাঁড়িয়ে যেতে হত, প্রশ্নও করতেন হয়ত, কিছু বলবে কি মেজদা? একটু হাসলে যেন, কিছু বলবার আছে কি?

মেজদার দিকে না তাকিয়ে ভেতরে চলে গেলেন ডাঃ চক্রবর্তী। মেজদা মনে মনে নয়, মৃদু কণ্ঠে বললেন, তোমার এই মনোসিলেবিক জবাব দেবার অভ্যাস ছাড়াবো সুপ্রসন্ন, তবে তোমার মেজদা হয়ে জন্মেছি।

আলো জ্বেলে দিয়েছে ঘরে ঘরে।

ইন্দ্রাণীকে দেখা গেল না। কোথায় গেল সে?

লেবরেটরী ঘরের দোর ভেজানো, ঘর অন্ধকার। ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলেন।

কালো ঢাকা দেয়া বড় মাইক্রোসকোপটার গায়ে মাথা ঠেকিয়ে চেয়ারে বসে রয়েছে ইন্দ্রাণী, দেখলেন।

মাথা ওঠালো না ডাঃ চক্রবর্তী ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলেও।

এমন করে বসে কেন? কি হয়েছে? কাছে গিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন।

তবু মাথা ওঠালো না।

এভাবে বসে রয়েছ, কি হয়েছে তোমার বুঝতে পারছি না। মেজদা বকেছেন ?

এবার জবাব মিলল, হ্যাঁ।

ওঁর কথায় কিছু মনে ক'রো না। কি বলেছেন জানি না, যা বলেছেন তোমাকে ভালবাসেন বলে বলেছেন।

তাই বলে বলবেন আপনার বাইরে যাওয়া না বন্ধ করতে পারিলে থাবড়া মেরে আমার নাক ভেঙ্গে দেবেন ?

হাসলেন ডাঃ চক্রবর্তী, তাই বলেছেন নাকি ? তুমি কি জবাব দিলে ?

গুরুজন লোক, কি জবাব দেব আমি ?

কিছু মনে করো না। মেজদার কথাবার্তা একটু ঐ রকমের। আর কি কথা হল ?

সব মনে নাই, ষ্টুপিড, বোকা, নির্বোধ এই কথাগুলো মনে আছে।

অভিধান উজাড় করে বকেছেন দেখছি। খুব রাগ হয়েছে বল ? অন্ধকারে বসে কাঁদছিলে ?

না, ভাবছিলাম।

ভাবছিলে ? তোমার চুলে—

আমি পরিনি, আমি পরিনি, বকে ঝকে উনি আদর জানালেন পরিয়ে দিয়ে। বললেন, ইন্দ্রাণী সান্যালের মাষ্টারনী রূপ—

উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, না থেমে বলে চলল, আমি চুলে ফুল পরলে কেউ খুশী হন এক সময়ে জানতাম, এখন কিছু বলছেন না তো তিনি ? কি হল তাঁর ?

কাছে এসে দাঁড়ালেন সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না ইন্দ্রাণী, মন ঠিক করতে পারলে কি এতদিন পরে ?

মেজদার হাতে মার খাবার ভয় করতে হল যে, ডাঃ চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল।

তারপর সুর বদলে বলল, আমাকে মাফ করো, নিজে কষ্ট পাচ্ছিলাম, তোমাকে কষ্ট দিচ্ছিলাম।

তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলল, নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারিনি প্রথমে। তারপরে নিজের মন চঞ্চল হয়ে উঠল, মনকে বোঝালাম মাধবীকে ভালবেসেছিলে তুমি প্রাণ দিয়ে, আমাকে দেবার মত কিছু হাতে নাই তোমার। আরও বুঝিয়েছিলাম মনকে আর কোন মেয়েকে মাধবীর জায়গায় বসিয়ে তার স্মৃতির অপমান করতে পারো না তুমি। এতগুলো জিনিস ভেবে নিয়ে নিজেকে আটকে রেখেছিলাম এতদিন, আমার জন্য এত কষ্ট পাচ্ছ তুমি ভাবতে পারিনি।

কি বলছিলেন সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বাধা দিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, তোমার কোন কৈফিয়ৎ দেবার নাই, চুপ করে শোন আমার কথা।

বেশ, বলো।

যতটা পাবো তাই নিয়ে খুশী থাকব আমি, তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, ইন্দ্রাণী বলল।

তোমার আশ্বাসে আমার আকণ্ঠ পূর্ণ হল, সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী হেসে বললেন। আমিও তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যতটা তুমি দিতে পারবে তাই নিয়ে খুশী থাকব, জোর করে চাইব না কিছু। নিজের ভার এতকাল বয়ে এসেছি একা, আর পেরে উঠছিলাম না ইন্দ্রাণী। মানুষ যে নিজের ভারে এত কাতর হতে পারে জানতাম না আগে। আজ তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার কাছে আসতে স্বীকার করলে এতে পর্বতপ্রমাণ ভার হালকা হয়ে যাচ্ছে। সকলের সহানুভূতি কুড়িয়ে দীর্ঘ বারো বছর বেঁচে রয়েছি আমি, এ বাঁচাকে বাঁচা বলা যায় না। ভালবাসা দেবার, নেবার লোক কাছে না থাকলে মানুষ ক্রমে একা, অসহায় হয়ে পড়ে। তুমি আমার কাছে থাকো, চোখের সামনে ঘুরে ফিরে বেড়াও, হেসে কথা বলো বন্ধুরূপে, সঙ্গীরূপে, আমার অসহায় নিঃসঙ্গতা বোধ দূর হোক, এইটুকু পেলে চালিয়ে নিতে পারব আমি।

হেসে ফেলল ইন্দ্রাণী, বলল, আমি পারব না। একটি মেয়ে যখন ভালবেসে একজন পুরুষের কাছে ধরা দেয় তখন সে কি চায় মনে

মনে তোমার মাইক্রোসকোপের মতে? ডাঃ সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী বড় বিজ্ঞানী, অসাধারণ লোক হতে পারেন কিন্তু ডাঃ ইন্দ্রাণী সান্যাল একটি সাধারণ মেয়ে, তার চাওয়া একটি সাধারণ মেয়ের মত। সে স্বামী চায়, সংসার চায়, সন্তান চায়। বুঝলেন ডাঃ চক্রবর্তী?

হাসলেন সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী, উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ, তাঁর দৃষ্টি। আরও এগিয়ে এলেন ইন্দ্রাণীর কাছে, এক হাত বাড়িয়ে চিবুক ধরে দেখতে লাগলেন ইন্দ্রাণীকে, বললেন, রোম থেকে পাঠানো সেই ছবিখানার চাইতে আরও সুন্দর ছবি দেখছি সামনে, কি যে ভাল লাগছে দেখতে।

এতক্ষণ পরে একটু লাল হল ইন্দ্রাণীর মুখ, হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের মুখের ওপরে চেপে ধরল।

একটু পরে হাত সরিয়ে ধরে রেখে বলল, ওসব কথা বেশী ব'লো না, আমার পক্ষের কথা মুখ ফুটে বলতে পারছি না এখনও।

তারপর বলল, রাত হয়ে যাচ্ছে, বাড়ীতে যেতে দেবে, না এখানে ধরে রাখতে চাও? একা যেতে ভয় করবে আজ।

ভয় কিসের, বাড়ী পৌঁছে দেব আমি। মেজদা বসে রয়েছেন, তাঁর কাছে একটু বসে যাও।

তুমি চলো।

যাচ্ছি একটু পরে, তুমি যাও।

আচ্ছা। ঘরের সব আলোগুলো জ্বেলে দাও তো।

মাধবীর ছবির নীচে গিয়ে দাঁড়াল একটু সময়। দেয়ালে মাথা ঠেকাল, কি বলল মনে মনে, তারপর চোখ মুছল আঁচল তুলে।

সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে দেখলেন নির্বাক হয়ে। ভেতরে যে উচ্ছ্বাসের ঢেউ ফেনিয়ে উঠছিল সংযত করলেন তাকে।

কিছুটা জল জমেছিল ইন্দ্রাণীর চোখে মনে হয়, দেবীপ্রসন্ন বাবুর সামনে চেয়ারে বসে চোখ মুছতে লাগল বার বার।

কথা বলে বাধা দিলেন না তিনি। তাঁর নিজের মুখের চেহারা সকরুণ হয়ে উঠল।

কত কি কথা মনে হতে লাগল তাঁর।

মনে হল এই চোখের জলটুকু বুঝি মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস। ভালবাসা পেয়ে ভালবাসা দিয়ে সুখের স্বর্গরাজ্যের দোর সামনে খোলা দেখে যারা কাঁদতে পারে, বুঝতে হবে মানুষের জীবনের অতি দুর্লভ অভিজ্ঞতা তাদের হল। এ তো হারিয়ে ফেলে কান্না নয়, পেলাম না বলে কান্না নয়, এ যে সব পাওয়ার কান্না।

যে কৌতুকপ্রিয় সৃষ্টিকর্তা মানুষের জীবন মরণ, সুখ দুঃখ নিয়ে কৌতুক করেন, এই কান্নার আলোকরেখা সোজা গিয়ে আঘাত করে তাঁর বুকে, আনমনা করে দেয় দু'এক মুহূর্তের জন্য, হয়ত তাঁর মনে পড়ে যায় স্বর্গ-উদ্যানের কোথাও তো এ অপরূপ কান্নার পারিজাত ফোটে না, দেবতাদের চোখে নগণ্য, অবহেলিত মাটির পৃথিবীর বুকে, মানুষের অন্তরে এর জন্ম।

তাঁর নিজের বুড়ো চোখ দু'টো, যা দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর কত কিছু দেখেছেন, ভিজে উঠছে মনে হল দেবীপ্রসন্ন বাবুর।

হাত দিয়ে চোখ মুছলেন।

ইন্দ্রাণী দেখল।

উঠে এসে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, বলল, মেজদা, বাড়ী যাই এবার, অনুমতি দাও।

বোস একটু, যাবি। বড্ড আঁধার, নইলে দু'জনে গল্প করতে করতে যেতে পারতিস।

ভৃত্যকে ডাকলেন, বাহাদুরকে বলো গাড়ী বের করুক।

——*——

মে, ১৯৫০

অধ্যাপক শ্রীননীমাধব চৌধুরীর কয়েকখানি বই

মোপাসাঁর গল্প—সবুজপত্রে প্রকাশিত মোপাসাঁর নয়টি বিখ্যাত গল্পের মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ। প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাসহ। মূল্য—২৲

সামাজিক চুক্তি—রুশোর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ Contrat Social-এর মূল ফরাসী থেকে বাংলা অনুবাদ। মূল্য—৩৲

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রামাণিক ইতিহাস (১৯০৫-৪৮) আশ্রয় করে রচিত বাংলা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি ডকুমেণ্টারী পোলিটিকেল উপন্যাস। স্বদেশী যুগ হতে আরম্ভ করে গান্ধীজীর হত্যা পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের বাস্তব রূপায়ন।

রাজনগর—(১৯০৫-১৯০৬) মূল্য—৪৲

(জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স)

দেবানন্দ—(১৯০৭-১৯০৮) মূল্য—৪৲

(গুরুদাস চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স)

স্ফুলিঙ্গ—(১৯০৯-১৪) মূল্য—২·৫০

অভিযাত্রী—(১৯১৫-১৯) মূল্য—৪৲

লুপুংগুটু (গল্প সংগ্রহ)—উদয়ন, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত, সমালোচকগণ কর্তৃক বহু প্রশংসিত নয়টি গল্পের সংগ্রহ। "লুপুংগুটু" চাইবাসার কাছে একটি হো পল্লীর নাম, প্রথম গল্পটি এই আদিবাসী পল্লীর পটভূমিকায় রচিত। এই সংগ্রহে আছে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, কথাসাহিত্যের রচনাশৈলী, ভাব ও বর্ণনা বৈভবের দর্শনস্বরূপ, প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বিখ্যাত গল্প "কনকলেখা"। মূল্য—২৲

নূতন সিরিজের উপন্যাস

প্রোঃ ইন্দ্রাণী সান্যাল— মূল্য—চারি টাকা

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২